যৌন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান

বিদ্যুৎ মিত্র

স্বীকারোক্তি:

বাংলা e-book-এর পাঠকেরা ছড়িয়ে আছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে এবং সব জায়গার ইন্টারনেট কানেকশনের গতি সমান নয়। তাই চেষ্টা করতে হয়েছে ফাইলের সাইজ যথা সম্ভব ছোট রাখার। ফলে অনিবার্য ভাবে কমাতে হয়েছে ছবির Resolution. পাঠকের এই অসুবিধার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

Scanned by: Shabab Mustafa

Send your feedback at:
Shabab.mustafa@gmail.com

আত্ম-উন্নয়নের
আরও ক'টি বই
বিদ্যুৎ মিত্র:
নিজেকে জানো
জনপ্রিয়তা
সুখ-সমৃদ্ধি
আত্মসম্মোহন
ধূমপান ত্যাগে আত্মসম্মোহন
সঠিক নিয়মে লেখাপড়া
খালিহাতে আত্মরক্ষা
আত্ম-উন্নয়ন
মন-নিয়ন্ত্রণ (প্রজাপতি)
বিশু চৌধুরী:
স্বর্ণ শিখর

যৌন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান

বিদ্যুৎ মিত্র

সেবা প্রকাশনী

ঊনত্রিশ টাকা

ISBN - 984 - 16 - 6002 - 4
প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল, ১৯৭৪
সপ্তম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৯৩
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী
মুদ্রাকর:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা:
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
শো-রুম:
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Jowna Bishoye Shadharan Gyan
By: Bidyut Mitra

ভূমিকা

[পঞ্চম সংস্করণ]

আবার পরিবর্তন করতে হল নাম।

প্রথমে বইটির নাম ছিল 'যৌন সঙ্গম—সন্তানোৎপাদন, স্বর্গীয় প্রেম, বা নিছক দৈহিক তৃপ্তি?' পাঠক পাঠিকার পরামর্শ অনুযায়ী সেই জবড়জঙ্গ নাম ছোট করে দ্বিতীয় সংস্করণে রাখা হল শুধু 'যৌনসঙ্গম'। কিন্তু এখন চিঠি আসছে—বড় সোজাসুজি বলা হচ্ছে কথাটা, উচ্চারণ করতে জিভে বাধে, লজ্জা হয়; দোকানে গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হয় কোন্ বইটা চাই।

কথাটা ভেবে দেখবার মত। সঙ্কোচ তো হতেই পারে। কিন্তু সঙ্কোচ যেমন স্বাভাবিক, তেমনি ঠাণ্ডা কোন নাম খুঁজে বের করাও কঠিন। অনেক বাছ-বিচার করে শেষ পর্যন্ত নাম স্থির হল 'যৌন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান'। এখন এটিও আবার পরিবর্তন করতে না হলেই হয়।

শুধু নামই নয়, পাঠকের পরামর্শে অনেক কিছুই পরিবর্তন করা হয়েছে বইটিরঃ বিষয়ান্তর্ভুক্ত হয়েছে 'শিশুদের যৌনশিক্ষা,' দূর করা হয়েছে কয়েকটি জায়গার অতিসংক্ষেপ ও অস্পষ্টতা—এবার যোগ হল 'আরও কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর।'

এ বইটিকে যাঁরা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছেন, যাঁরা সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আপন সন্তানের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন, এবং যাঁরা সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন—তাঁদের সবাইকে জানাচ্ছি অশেষ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বিদ্যুৎ মিত্র

সূচিপত্র

৯	কেন এ বই লেখা	একজিবিশনিস্ট	১১০
	যৌনশিক্ষা	ট্র্যান্সভেস্টাইট	১১১
১৪	যৌনশিক্ষায় আপত্তি	ফিটিশিজম	১১২
২৬	শিশুদের যৌনশিক্ষা	স্যাডিজম	
	জননেন্দ্রিয়	ও ম্যাসোকিজম	১১৩
৪৮	লিঙ্গের আকার	বেশ্যাবৃত্তির স্বরূপ	১১৫
৫২	কেন কি হয়	বেশ্যারা কি সঙ্গমের	
৫৬	নারীর চরমানন্দ	আনন্দ লাভ করে	১১৭
	সঙ্গম	গর্ভপাত কি ও কেন	১১৮
৬১	সঙ্গমের উদ্দেশ্য	কিভাবে	
৬৪	সঙ্গমে তৃপ্তি	গর্ভপাত ঘটানো হয়	১২০
	যৌন অক্ষমতা	জন্ম-নিয়ন্ত্রণ	
৭৩	পুরুষের যৌন অক্ষমতা	জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি	১২৩
৭৮	কোনটা স্বাভাবিক বলব	নিরাপদ পদ্ধতি	১২৭
৮২	প্রতিকার কি	ছেলে চাই, না মেয়ে	১২৯
৮৯	নারীর যৌন জড়তা	ছেলে চাইলে	১৩১
	স্বমেহন	মেয়ে চাইলে	১৩২
৯৪	স্বমেহনে পাপবোধ	কেন এ নিয়ম	১৩৩
	আরও কিছু প্রশ্ন	অশ্লীল সাহিত্য	
	ও তার উত্তর	কেন আকর্ষণ	১৩৫
	দুর্ঘটনায় অণ্ডকোষ কাটা	বার্ধক্য	
১০৪	পড়লে কি হবে	শারীরিক পরিবর্তন	১৪০
	সুন্নৎ বা মুসলমানীর	বার্ধক্যে নারী	১৪২
১০৭	উপকারিতা	পুরুষের বার্ধক্য	১৪৮
১০৮	যৌন-বিকৃতি কোনটা	বার্ধক্যের প্রেম	
১০৮	পিপিং টম	যে যাই বলুক	১৫৬

পুত্রকে—

কেন

এ বই লেখা

আজ তুমি পাঁচ বছরের শিশু। তাই কামোন্মত্ত কুকুর-কুকুরী দেখে সবার সামনে হি হি করে হেসে খুন হয়ে যেতে পারো। লোকজনের মধ্যে লজ্জায় ফেলে দিতে পারো তোমার সহজ সরল মন্তব্য দিয়ে।

'আব্বা, টমি না, আরেকটা কুকুরের নেংটি চাটছে।' খানিক বাদেই ছুটে এসে থুতনি ধরে টানতে পারো, 'হায় হায়, দেখে যাও আব্বা, ঘাড়ে উঠেছে এবার! কি করছে ওরা, আব্বা?'

'খেলা করছে। যাও তো বাবা, তোমার জীপ গাড়িটা চালাওগে ওই বারান্দায়।'

লোকজনের সামনে এছাড়া আর কিছু বলবার নেই এখন। কিন্তু আর ঠিক দশটা বছরের মধ্যে অদ্ভুত সব পরিবর্তন লক্ষ করতে শুরু করবে তুমি তোমার নিজের শরীরে। আশ্চর্য এক

আবেগের স্রোত ছেয়ে ফেলতে চাইবে তোমার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব। কূল ছাপিয়ে উঠতে চাইবে প্রচণ্ড এক জোয়ার। অসংখ্য প্রশ্ন উঠবে তোমার মনে। তখন আর আমার চিবুক ধরে টানবে না তুমি, জিজ্ঞেস করবে না—আব্বা, আমার ভেতরটা এমন করছে কেন।

সামাজিক অনুশাসন রয়েছে। ততদিনে তুমি শিখবে এসব নিয়ে বড়দের সঙ্গে আলাপ করতে নেই। অদম্য কৌতূহল হবে তোমার, ভীষণ ইচ্ছে করবে জানতে, কিন্তু খোলাখুলি কোন কথা জিজ্ঞেস করা সম্ভব হবে না তোমার পক্ষে, কান লাল হয়ে উঠবে এসব নিয়ে আমি যদি কথা তুলতে যাই। লজ্জা, লজ্জা, লজ্জা!

আজ আমি ভাবছি সন্তানকে যৌন বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দেয়া বাপ-মায়ের কর্তব্য, কিন্তু কে জানে হয়ত তখন আড়ষ্টতায় ভুগবো আমিও, হয়ত ইচ্ছে থাকলেও এসব আলোচনা তুলতে পারব না তোমার সামনে। কিংবা হয়ত তার অনেক আগেই মারা পড়ব কোন দুষ্কৃতকারীর ছোরা খেয়ে। স্কুল-কলেজে যে তোমাকে এসব ব্যাপারে সুশিক্ষা দেয়া হবে তার কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।

তাই আমি লিখে রেখে যেতে চাই।

বাজারে যৌন সংক্রান্ত বইয়ের অভাব নেই। কিন্তু বেশির ভাগ বইয়ে ভুলের বহর দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। আধুনিক

দৃষ্টিভঙ্গি তো নেই-ই, অসংখ্য ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এরা যুবক-যুবতীর মনে। একরাশ বস্তাপচা ত্রুটিপূর্ণ ভ্রান্ত তথ্যের সমষ্টি ভুলের বিষ ছড়াচ্ছে বিনা বাধায়।

আমি চাই না আমার সন্তান অশিক্ষিত চাকর বাকরের কাছ থেকে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কুশিক্ষা গ্রহণ করুক। আমি চাই না আমার সন্তান তার অপরিণত সম-বয়সী ছেলেদের কাছ থেকে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করুক। আমি চাই না আমার সন্তান বাজারের এসব বই পড়ে ভ্রান্ত ধারণার শিকার হোক। জীবনের এই দিকটায় যদি ভুল থেকে যায় তাহলে কোনদিনই তুমি পরিপূর্ণ সুখী মানুষ হিসেবে দাঁড়াতে পারবে না মাথা উঁচু করে।

তোমার দাদা আমাকে যৌন-শিক্ষা দেননি। তিনি আশা করেছিলেন কোন না কোন উপায়ে জেনে নেবো আমি কেন কি হয়। অনেক ভুলের পাহাড় ডিঙিয়ে, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে শিখে নিতে হয়েছে আমাকে। কচি মনে গেঁথে যাওয়া অনেক কু-শিক্ষার কাঁটা তুলতে হয়েছে অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে, অনেক বই ঘেঁটে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার বাবা অন্যায় করেছিলেন আমার প্রতি। কিন্তু কে জানে, তুমি যখন বড় হবে তখন আমিও আমার বাবার মতই অন্যায় করব কিনা। যদি মুখ ফুটে কিছু বলতে না পারি, তাহলে বইটা রইল, পড়ে নিয়ো।

নারী-পুরুষের উলঙ্গ-চিত্র প্রচার এই বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বানোয়াট গল্প দিয়ে বইটিকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়নি, দেখতেই পাচ্ছো। তাছাড়া কাকে কি বলে সে-সব বোঝাবার চেষ্টা করিনি আমি—ওসব যে-কোন ভাল বই ঘাঁটলেই পাবে। শুধু যে-সব ব্যাপারে তোমার ভুল ধারণা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সেসব নিয়ে আলোচনা করব আমি এ বইয়ে। সাদামাঠা তথ্যগুলো বাদ দিয়ে গেলাম—আমি তোমাকে জানাবঃ কিসে কি হয়, কিভাবে হয়, কেন হয়; কোন্‌টা ভুল, কোন্‌টা ঠিক।

যৌনশিক্ষা

যৌনশিক্ষায় আপত্তি

'আমি পারব না, বাবা—আমার লজ্জা লাগে! যে যাই বলুক, ওসব নোংরা কথা বাচ্চাদের শেখাতে পারব না আমি কিছুতেই। তাছাড়া বড় হলে তো নিজেরাই শিখে নেবে। এখন এসব জ্ঞান দিয়ে কি করবে ওরা? কি দরকার এই বয়সেই ঘটা করে এসব শেখাবার? বিয়ের বয়স হলে কারও কি আর জানতে বাকি থাকে কিছু?'

'নিজেরা শিখে নেবে ঠিকই, কিন্তু আমার বুঝতে হবে জন্মরহস্য, বিয়ে এবং নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের বিষয়ে আমি যদি আমার সন্তানকে সঠিক শিক্ষা না দিই, ওরা শিখবে হয় অশিক্ষিত চাকর-চাকরানী, নয়ত সমবয়সী অপরিণত বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে। সে শিক্ষার গোড়াতেই ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা শতকরা নব্বই ভাগ। সব কিছুর খুঁটিনাটি নিয়ে ওদের সাথে আলাপ করতে তো আর কেউ বলছে না, কিন্তু সঠিক জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করে দেয়া বাপ-মায়েরই

দায়িত্ব। এটা এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। রেডিওর ভিতরে ছোট ছোট মানুষ থাকে, তারাই গান গায়, কথা বলে—এ শিক্ষা যেমন ভুল ও ক্ষতিকর, তেমনি ক্ষতিকর ওদের বলাঃ আকাশ থেকে পড়েছ, রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি, বাজার থেকে কিনেছি। জন্ম-রহস্য জানলেই যে ছেলেপিলেরা জন্ম দেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠবে, সেটা ঠিক সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। তাছাড়া শিশুর পক্ষে সেটা সম্ভবও নয়। সঠিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সবকিছু সম্পর্কে শিশুর মধ্যে একটা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে দেয়া, যাতে সহজ, স্বাভাবিক ও সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠে সে একজন দায়িত্বশীল পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়। কোন একটা বিষয়ে অজ্ঞতা বা ভুল জ্ঞান বিশাল প্রাচীরের মত বাধা দেবে ওকে অগ্রযাত্রায়। ছেলে-মেয়েকে যেমন ঠিকভাবে দাঁত মাজা, বাথরুম ব্যবহার করা, সন্ধের সময় হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসা, ঘুমানো, সামাজিক আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়াটা বাপ-মায়েরই দায়িত্ব, তেমনি যৌনশিক্ষার ভিত্তি তৈরি করে দেয়াটাও তাঁদেরই কর্তব্য।'

'কিন্তু এসব দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে কেন? স্কুল শেখাতে পারে না? শিক্ষার অঙ্গন হচ্ছে স্কুল-কলেজ। বাপ-মাকে সংকোচের মধ্যে না ফেলে এসব শিক্ষার ভার স্কুল কলেজের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না?'

'দিতে পারলে হয়ত কিছুটা বেঁচে যেতাম, কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে এ নিয়মের প্রচলন নেই। যখন হবে তখনকার কথা একটু আগে ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে আসলে কোন ফায়দা নেই। ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে যা শিখবে সেটা বাড়ি আসতে আসতে ভুলে যাবে না নিশ্চয়ই? বাড়িতেও আলোচনা করতে চাইবে ওরা, যেটা বুঝবে না বা যে প্রশ্নটা নতুন উদয় হবে মনে তার জন্যে স্কুলের অপেক্ষা না রেখে বাপ-মাকেই জিজ্ঞেস করবে। তখন কি ধমক দিয়ে থামিয়ে দেব ওদের? তারচেয়ে সরাসরি সমস্যার মোকাবিলা করাই ভাল না? ওদের যদি থামিয়ে দিই বা উত্তর এড়িয়ে যাই, একটা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব দেখাই, ওরা ধরে নেবে এসব অত্যন্ত গোপনীয় খারাপ কথা—গালিগালাচ বা অশ্লীল নোংরা কথা বলার মত। বাপ-মাকে এড়িয়ে অন্যত্র উত্তর খুঁজবে ওরা তখন, ক্রমে ক্রমে বাপ-মার মানসিক সান্নিধ্য থেকে সরে যাবে অনেক দূরে। তাছাড়া স্কুল-কলেজে আনুষ্ঠানিক ভাবে যা শিক্ষা দেয়া হয় সেটা সব সময়ই আংশিক। সামগ্রিক শিক্ষা নিতে হয় মানুষকে জীবন থেকে, এবং তার ভিত্তি তৈরি করে দিতে হয় বাপ-মাকে অন্তরঙ্গ পারিবারিক পরিবেশে, শৈশবেই।'

'কিন্তু…এসব জঘন্য, অসুন্দর, পাপের কথা ওদের না শেখালেই কি নয়?'

'শিশুদের কচি মনে জঘন্য, অসুন্দর বা পাপের কথা কখনোই ঢোকানো উচিত নয়। যৌন সংক্রান্ত অপরাধ এবং প্রচুর কুৎসিত কর্মকাণ্ড রয়েছে দুনিয়ায়, সেসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ওদের জন্যে সত্যিই ক্ষতিকর। কিন্তু শরীরবিদ্যা বা জন্ম-রহস্য যদি কারও কাছে অসুন্দর বা পাপ বলে মনে হয় তাহলে তার উচিত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার আগে যত শীঘ্রি সম্ভব নিজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে নেয়া। মায়ের শরীরে শিশুর জন্ম হয় এই সহজ তথ্য ছেলেমেয়েদের জানানর মধ্যে, শরীরের ভিতর লাল রক্ত আছে, দিন দিন মাথার চুল বড় হয়, কিংবা পাকস্থলীর কাজ খাদ্য হজম করা, এইসব তথ্য জানাবার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর কিছু নেই।'

'এত অল্প বয়সে সব শিখিয়ে দিলে ওরা নিজেরা এক্সপেরিমেন্ট করবে না?'

'না শেখালেও করবে। আচরণ আর তথ্য সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস—দুটোকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হচ্ছে না। আগুনে হাত দিলে পুড়ে যায় বা ব্যথা লাগে, কিংবা জীবন্ত বৈদ্যুতিক তার ধরলে শক্ লাগে একথা শিশুদের জানিয়ে দেয়া ভাল, এ ব্যাপারে খুব একটা মতবিরোধ নেই। কিন্তু আমার ছেলেটা যদি পাশের বাড়ির মেয়েটার হাত পুড়িয়ে দেয়, কিংবা তাকে ইলেকট্রিক তার ধরতে বলে বা বাধ্য করে, সেটাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। তথ্য জানাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু সেইসাথে

তাকে আদব-কায়দা, আচার-আচরণও তো শিক্ষা দিচ্ছি। তথ্য জানা না থাকলেই বরং এক্সপেরিমেন্টের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে ওদের মধ্যে।'

'ছেলেমেয়েদের বই পড়তে দিলেই তো হয়ে যায়, মা-বাবার এই লজ্জাকর অবস্থার মোকাবেলা না করলেই কি নয়?'

'কিছুই না বলার চেয়ে বই পড়তে দেয়া ভাল। কিন্তু এটা মন্দের ভাল। পড়তে না শেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে—এক। দুই—পাঠের সাথে আলোচনা যোগ না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এই জ্ঞান গ্রহণ বা দানের মধ্যে লজ্জা এসে বাধা সৃষ্টি করলে বুঝতে হবে আমাদের নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারটা সম্পর্কে ক্রটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রয়ে গেছে। আমাদের ক্রটির জন্যে ছেলেমেয়েদের যদি আংশিক শিক্ষা দেই, আর যাই হোক সেটা আমাদের যোগ্যতার পরিচয় বহন করে না।'

'এসব শিখিয়ে দিলেই ছেলেমেয়েরা আর ভুল করবে না এমন কোন নিশ্চয়তা আছে?'

'নেই। সব জেনেশুনেও বারো বছর বয়সে সামান্য ভুলে মা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য দেশে যথেষ্ট রয়েছে। এটাও সেই তথ্য আর আচরণের সমস্যা। ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলতে হলে কেবল ইংরেজি, ভূগোল, জ্যামিতি বা যৌনশিক্ষা দিলেই চলছে না, আরও অনেক নৈতিক বিষয়ে জ্ঞান দিতে হচ্ছে, শেখাতে হচ্ছে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার।

জীবনটা খুঁটিনাটি আরও অনেক কিছুর সমষ্টি। ভুলটা হচ্ছে অন্যত্র, তথ্যের দোষ দিয়ে লাভ নেই। সিগারেট বা মদ খাওয়া খারাপ জেনেও খাচ্ছে না মানুষ? অন্যায় জেনেও করছে না চুরি?'

'বুঝলাম। আমাকেই শেখাতে হবে। কিন্তু কতটা শেখাব?'

'যতটা জানতে চাইবে। গড় গড় করে সব বলে দেয়ার কোন দরকার নেই। কোন কোন ছেলেমেয়ের এসব দিকে একেবারেই খেয়াল থাকে না। লাটিম, মার্বেল, পুতুল আর ঘুড়ি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে অন্য কোন চিন্তার সময়ই পায় না। এদের ক্ষেত্রে একটু-আধটু আভাস দিয়ে কৌতূহল উদ্রেক করা যেতে পারে, কিন্তু যারা জানতে চায় তাদেরকে ঠিক যেটুকু জানতে চাইছে তার সঠিক উত্তর দেয়া উচিত।'

'ছেলেদের কি ঋতুস্রাব সম্পর্কে জানানর প্রয়োজন আছে?'

'জানতে চাইলে না জানাবারই বা কি আছে? ওটা শরীরের ঘাম বা প্রস্রাবের মতই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বৈ তো নয়।'

'অর্গাজম্ বা যৌনতৃপ্তি সম্পর্কেও জানাতে হবে?'

'যদি জানতে চায়। অল্প কথায়। তবে এই প্রসঙ্গে প্রাকবৈবাহিক যৌনমিলনের পরিণতি সম্পর্কে ওদের সাবধান করে দেয়ারও প্রয়োজন আছে। তেরো-চোদ্দ বছর বয়স

থেকেই ছেলেমেয়েরা যৌনপুলক অনুভব করতে শুরু করবে। যদি সুশিক্ষার ফলে ওরা বোঝে এটা অন্যায় কিছুই নয় তাহলে অনেক ভ্রান্ত ধারণা এবং মানসিক যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যাবে ওরা। বাপ-মার সাথে এই পুলকের ব্যাপারে আলোচনা করবার সাহস না পেলে ওরা অঘাটে-কুঘাটে খুঁজবে তথ্য, আজেবাজে লোকের মুখে শুনবেঃ এক ফোঁটা বীর্য শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মানে সত্তর ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে যাওয়া, রাতে বীর্যস্খলন ঘটলে ব্রেন নষ্ট হয়ে যায় ছাত্রদের, কৃত্রিম উপায়ে স্খলন ঘটালে যৌন-অক্ষমতার শিকারে পরিণত হয় পুরুষ, মেয়েরা ভগাঙ্কুর নাড়াচাড়া করলে অসুখী হয় বিবাহিত জীবনে, ইত্যাদি নানান রকমের মারাত্মক ভুল কথা। এবং বিশ্বাস করে অশেষ যাতনা ভোগ করবে।'

'আগামী বাচ্চার কথা ছেলেমেয়েদের কি জনানো ঠিক?'

'নিশ্চয়ই ঠিক। গোপন রাখা আসলে যায় না, যতই কানাঘুষা, ফিসফাস করে চেপে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন ঠিকই টের পেয়ে যায় ওরা। মায়ের পেটটা ঢোল হয়ে উঠছে, ছোট ছোট জামাকাপড় তৈরি হচ্ছে, ঘন ঘন ডাক্তারের কাছে যাওয়া-আসা হচ্ছে, জিজ্ঞেস করলে লজ্জা-লজ্জা হাসি হেসে উত্তর এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে—এতসব দেখেও ছেলেমেয়েরা কিছুই বুঝতে পারছে না, সেটা হতেই পারে না। কিছু একটা আন্দাজ ওরা করেই নেয়। তারপর যখন

হাসপাতাল থেকে বাচ্চা কোলে নিয়ে ফিরে আসে মা, তখন বুঝে নেয় ওরা—ও, এই জন্যই এত ঢাকাঢাকি চলছিল এতদিন, নিশ্চই ব্যাপারটা লজ্জাকর কিছু, খারাপ কিছু। তার চেয়ে খোলাখুলি জানিয়ে দেয়াই ভাল না? তবে পুরো নয়টা মাস ওদের অপেক্ষায় রেখে কষ্ট দেয়ার চেয়ে মাস দুয়েক আগে জানালে ওরাও ভাই হবে না বোন হবে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনাতে অংশগ্রহণ করে আনন্দ পেতে পারবে। হঠাৎ করে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাই বা বোনের আবির্ভাব ঘটলে শিশুদের মনে যে ঈর্ষা, নিঃসঙ্গতা আর বেদনার ভাব সৃষ্টি হয় তার থেকে রেহাই পেয়ে যাবে তারা আগে থেকে জানা থাকলে, আগমনের প্রতীক্ষায় থাকলে। আগে থেকে জানা ছিল না বলেই হাসপাতাল থেকে মাকে নতুন বাচ্চা নিয়ে ফিরতে দেখে অবাক হয়েছিল এক চার বছরের শিশু, সারা দিন যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছিল, মা নতুন বাচ্চাটাকে আদর করছে দেখেও কিছুই বলেনি, কিন্তু সন্ধের দিকে বলতে বাধ্য হয়েছিলঃ হয়েছে, আম্মা, এবার ফেরত দিয়ে আসো ওকে, ওর মা কানছে।'

'আমি না হয় সঠিক শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওদের দাদী-নানী আর খালা-ফুফুদের উদ্ভট গল্পের হাত থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করবার কি উপায়? তাদের মুখ বন্ধ করা কি সম্ভব?'

'সত্যি, একেকজন একেক গল্প বলে বাচ্চাদের মাথা ঘুলিয়ে দেয়াটা একটা সমস্যাই বটে। কেউ বলছে আকাশ থেকে টুপ করে ছেড়ে দেয় আল্লা বাচ্চাদেরকে মায়ের কোলে, কেউ বলে বুম করে পেট ফেটে বেরিয়ে আসে, কেউ বলে গাছ থেকে পেড়ে আনা হয়, কেউ বলে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। মুশকিল হচ্ছে, বাচ্চারা বড়দের সব কথা বিশ্বাস করে, তাদেরকে দু'তিন রকম কথা বললে কার কথায় ঠিক বিশ্বাস রাখা যায় বুঝে উঠতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে বাচ্চাদের যদি বলে দেয়া যায় বড়দের অনেকে ছোটদের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলাপ করতে অনর্থক লজ্জা পায় বলে মিছেমিছি গল্প বানিয়ে বলে—তাহলে ওরা নিজেরাই আত্মরক্ষা করতে পারবে।'

'বাচ্চাদের সাথে সব ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করলে বিপদে ফেলে দিতে পারে বেমক্কা জায়গায় বেকায়দা প্রশ্ন করে, তখন? হয়ত ছোট খালার অবিবাহিত বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করে বসল তার পেটে বাচ্চা আছে কিনা, কিংবা আর্ট এগজিবিশন দেখতে গিয়ে উঁচু গলায় চেঁচিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে কোন ছবির লিঙ্গের প্রতি, তখন?'

'এসব ব্যাপারে আগেই শিক্ষা দিতে হবে ওদের। বুঝিয়ে দিতে হবে সব আলোচনা সবখানে করতে নেই। লোকজনের মধ্যে বসে পুট-পুট দুর্গন্ধ ছাড়া, বা যেখানে সেখানে পায়খানা প্রস্রাব করতে বসা যেমন অসভ্যতা, তেমনি মিলাদ মাহফিলে

"সে যে কেন এলনা" বা "নানীগো নানী" গেয়ে ওঠা বেয়াদবি, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ছাড়া আর কারও সামনে যৌন বিষয়ে আলোচনা করা অশালীন। বাচ্চাদের মধ্যে রুচিবোধ ঢুকিয়ে দিতে পারলে আর কোন বিপদে ফেলবে না তারা।'

'আমার বাচ্চারা যখন পাড়ার আর সব বাচ্চাদের শেখাতে গিয়ে দুর্নাম কুড়োবে, ওদের বাপ-মায়ের কাছে বকা খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরবে তখন কি করব?'

'পাড়ার আর সব বাপ-মাকে বোঝাবার চেষ্টা করা উচিত যে শিশুদের যৌন শিক্ষা দেয়ার মধ্যে পাপ বা অন্যায় কিছুই নেই। কিন্তু মানুষকে কিছু বোঝানো বড় মুশকিল। নিজের ধারণা সহজে পাল্টাতে চায় না কেউ। এসব ক্ষেত্রে দৃঢ় হতে হবে আপনাকে। কেউ যদি এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় তাই বলে আমি আমার সন্তানকে অশিক্ষিত রাখতে পারি না। আমার ছেলেমেয়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের যে নষ্ট করছে না, বরং সঠিক, সত্য জ্ঞান দিচ্ছে, এটা যদি তাদের বোঝাতে পারি, খুবই ভাল কথা; না পারলে সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে মানুষের অন্ধ-বিশ্বাস ও অজ্ঞানতার কথা নিজের ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দেয়া।'

'কোন অঙ্গের কি নাম, কাকে কি বলে, অতসব পষ্টাপষ্টি বাচ্চাদের জানবার কি দরকার? রেখে ঢেকে আবছা করে বললে কি কোন ক্ষতি আছে?'

'আছে। শরীরের কোনও অংশ কোনও অংশের চেয়ে খারাপ নয়। হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ-কান, পায়খানা প্রস্রাব বমি থুথু কফ ঘাম—এসব ঠিক ঠিক চেনাতে দ্বিধা করছি না; লিঙ্গ যোনি জরায়ু অণ্ডকোষ ঋতুস্রাব বীর্যপাত যৌনমিলন সম্পর্কে ওদের পরিষ্কার ধারণা দিতে দ্বিধা করব কেন? নাম না বললে ওরা বুঝতেই বা পারবে কি করে ঠিক কি বলা হচ্ছে? যদি বলা যায়, মায়ের কোন একটা অঙ্গের মধ্যে বাবার কি যেন একটা জিনিস ঢুকিয়ে কিসের যেন স্খলন হলে, ইত্যাদি, ইত্যাদি—তাহলে জন্ম রহস্য সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞান অর্জন করবে শিশু? প্রত্যেকটা ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের সঠিক জ্ঞান না দিলে মারাত্মক বিপদও ঘটে যেতে পারে। ধর্ষণের কথাই ধরা যাক। সাত বছরের ফারহানা ওর আব্বাকে জিজ্ঞেস করল ধর্ষণ মানে কি। এতটুকু বাচ্চাকে আসল কথা জানানো ঠিক হবে না মনে করে আব্বা বললেনঃ এই ধরো কেউ আক্রমণ করল, মারল বা ধাক্কা দিল—সেটাকেই বলে ধর্ষণ। বাপ তো এড়িয়ে যেতে পেরে মনে মনে বাহবা দিলেন নিজেকে, ভাবলেন, চমৎকার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন—এবং ভুলে গেলেন ব্যাপারটা বেমালুম। ক'দিন পরের ঘটনা। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ার পরেও বসে আছে ফারহানা ক্লাসে এক কোণের বেঞ্চে। এদিকে ঝাড়ু দিতে দিতে জমাদার ওকে দেখতে পেয়ে বলেছেঃ ধুলো উড়ছে, খুকি, ছুটি হয়ে গেছে,

বাড়ি যাও এখন। নড়বার লক্ষণ নেই ফারহানার মধ্যে। বই হারিয়ে ফেলেছে একটা, বকা খাওয়ার ভয়ে কিছুতেই বাড়ি যাবে না। বার কয়েক অনুরোধ করেও যখন লাভ হল না, ওর হাত ধরে টেনে বের করে দিল জমাদার ক্লাস থেকে। ব্যস, আর যাবে কোথায়, আকাশ-পাতাল ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটল ফারহানা বাড়ির পথে। অফিস থেকে তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে মাত্র ফিরছেন বাবা। কি হয়েছে, কি হয়েছে? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন আব্বা। মেয়ে কোনমতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে উচ্চারণ করলঃ স্কুলের জমাদার···। কি করেছে জমাদার? ধর্ষণ করেছে। দ্বিরুক্তি না করে ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা বের করে নিয়েই ছুটলেন আব্বা স্কুলের দিকে, দেখামাত্র গুলি করলেন জমাদারের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে। এক গুলিতেই শেষ।

'ধর্ষণের সঠিক অর্থ জানা ছিল না ফারহানার। ওর ধারণা, জোর করে ক্লাস থেকে বের করে দেয়াকে ধর্ষণ বলা যায়। এবং এ জ্ঞান আহরণ করেছে সে তার আব্বার কাছেই। কাকে কি বলে যদি পরিষ্কার জানা থাকত ফারহানার, সংকোচ না করে ওর বাবা যদি ওকে সঠিক উত্তর দিতেন, তাহলে আর এই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকত না।'

শিশুদের যৌনশিক্ষা

'আচ্ছা, মা, বাচ্চা কোথা থেকে আসে?'

'মায়েদের পেট থেকে।'

'পেটের ভিতর যায় কি করে?'

'ফুলের মধ্যে যেমন রেণু হয়, তেমনি মায়ের শরীরে ছোট্ট ভ্রূণকোষ তৈরি হয়। তার থেকেই বড় হয়ে পুরো একটা বাচ্চা তৈরি হয়।'

'কতদিন লাগে?'

'প্রায় নয় মাস মত। কখনও কিছুদিন বেশিও লাগে, কখনও কম।'

'পেটের মধ্যে কোথায় থাকে ওটা? গু লেগে যায় না ওর গায়ে?'

'না। পেটের ভেতর ইউটেরাস বা জরায়ু বলে একটা জায়গা আছে। অনেকটা থলের মত। ওরই মধ্যে থাকে আর

বড় হয় বাচ্চা।'

'তারপর বেরোয় কি করে? পেট ফেটে?'

'না। যখন বাচ্চাটার জন্ম নেবার সময় হয়ে যায়, তখন জরায়ু নামের সেই থলিটার মুখ খুলে যায়। তার পর সরু একটা পথ দিয়ে বাচ্চাটা বেরিয়ে আসে বাইরে। পথটার নাম যোনিপথ। আর যেদিন ও বেরিয়ে আসে সেই দিনটাই ওর জন্ম-দিন।'

'আমার জরায়ুটা পেটের কোন জায়গায় আছে?'

'তোমার জরায়ু নেই।'

'আমার নেই কেন? আমার বাচ্চা কি করে হবে তাহলে?'

'তুমি ছেলে। তাই তোমার জরায়ুর কোন দরকার পড়বে না কোনদিন। তুমি তো কোনদিন মা হবে না। মেয়েদের কেবল বাচ্চা হয়। আর মেয়েরাই কেবল মা হতে পারে। এটাই নিয়ম। ছেলেরা বাবা হতে পারে। তুমি বড় হয়ে বাবা হবে, তোমার আপা বড় হয়ে আমার মত মা হবে—তোমাদের আব্বার মত বাবা হবে না।'

'আচ্ছা, মা, এত বড় আমি তোমার পেটের মধ্যে ছিলাম কি করে?'

'তখন তো তুমি আর এত বড় ছিলে না। পাঁচ বছর আগে এই এত্তোটুকু ছিলে।'

'যোনিপথ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম তোমার শরীর

থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'কই, আমার তো মনে নেই কিচ্ছু?'

'তখন তো তোমার কোন কিছু বুঝবার ক্ষমতা ছিল না। তাই মনে নেই। কারোই থাকে না। এখন অনেকটা বড় হয়েছ, এখন যা যা ঘটবে প্রায় সবই মনে রাখতে পারবে।'

'লুসি আপাও তোমার পেটের মধ্যে ছিল?'

'হ্যাঁ। তোমার জন্মের প্রায় পাঁচ বছর আগে ও ছিল আমার পেটের মধ্যে।'

'আব্বাও?'

'নারে, পাগল। তোমার আব্বা আমার পেটে ছিল না কোনদিনই। ও ছিল তোমার দাদীর পেটে।'

'তুমিও দাদীর পেট থেকে হয়েছ, মা?'

'না। আমি হয়েছি তোমার নানীর পেট থেকে।'

'ছোট ফুফুও নানীর পেট থেকে হয়েছে?'

'না। ও তোমার আব্বার বোন। দাদীর ছোট মেয়ে।'

'দাদীরও তাহলে জরায়ু আছে?'

'হ্যাঁ। সব মেয়েদেরই একটা করে জরায়ু থাকে।'

'লুসি আপারও আছে?'

'আছে। ছোট-বড় সব মেয়েদেরই জরায়ু আছে, যাতে তার ভেতর বড় হতে পারে তার বাচ্চা।'

'তাহলে লুসি আপার বাচ্চা নেই কেন? ও তো মেয়ে।'

'মেয়ে ঠিকই, কিন্তু ও ছোট মেয়ে। ছোট মেয়েদের বাচ্চা হয় না, বড় হলে তারপর হয়।'

'দাদী তো বড়, দাদীর আর ছেলেমেয়ে হচ্ছে না কেন?'

'মেয়েরা অনেক বয়স হয়ে গেলে আবার ছোট মেয়েদের মত হয়ে যায়। তাদেরও আর বাচ্চা হয় না।'

'আচ্ছা, মা, লুসি আপার নেংটি নেই কেন?'

'ওরও আছে, কিন্তু তোমার মত না। ওরটা অন্য রকম। ছেলেদেরটাকে বলে শিশ্ন বা লিঙ্গ, মেয়েদেরটাকে বলে যোনি। মেয়েদের লিঙ্গ থাকে না।'

'থাকে না কেন? আপার সমান হলে আমারটাও ঝরে যাবে?'

'ঝরে যাবে না। ছেলেদের লিঙ্গ থাকে, মেয়েদের যোনি। এভাবেই জন্মায় ওরা। যারটা যেমন তেমনি থাকবে সারাজীবন।'

'আচ্ছা, ভ্রূণকোষের কথা যে বললে, যেটা বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত বাচ্চা হয়, সেটা মায়েরা রাখে কোথায়?'

'জরায়ুর দুইপাশে দুটো ওভারি বা ডিম্বকোষ আছে। ওরই মধ্যে তৈরি হয় ওভাম বা ভ্রূণকোষ। খুব ছোট—খালি চোখে দেখা যায় না। ওগুলোর যে কোন একটা থেকে তৈরি হতে পারে একটা বাচ্চা।'

তৈরি হয়েই বড় হতে শুরু করে ভ্রূণকোষগুলো?'

'না। সব ভ্রূণকোষ থেকে বাচ্চা হয় না। ডিম্বকোষ থেকে জরায়ুতে আসছে ঠিকই, কিন্তু সবাই বড় হতে পারে না। বড় হতে হলে বাবার শরীর থেকে আরেকটা কোষ এসে মায়ের কোষের সহিত মিলিত হবে। এই দুটো কোষ মিলে এক হলেই বাড়তে শুরু করে, নয়মাস পর বেরিয়ে আসে পুরোপুরি একটা বাচ্চা হয়ে।'

'বাবার কোষটা থাকে কোথায়?'

'লিঙ্গের নিচের যে থলেটা আছে, ওটাকে বলে অণ্ডকোষ। ওরই মধ্যে তৈরি হয় সেই কোষ, ওখানেই থাকে। ওর নাম হচ্ছে শুক্রকীট।'

'আব্বা যদি শুক্রকীট তৈরি না করত তাহলে আমরা হতাম না?'

'না। জন্ম হতে হলে মায়ের ভ্রূণকোষ আর বাবার শুক্রকীটের মিলন হতে হবে।'

'কিন্তু, মা, বাবার শুক্রকীট মায়ের ডিম্বকোষে যায় কি করে?'

'ডিম্বকোষে যায় না। মায়ের ডিম্বকোষ থেকে ভ্রূণকোষ জরায়ুতে গিয়ে অপেক্ষা করে শুক্রকীটের জন্য। যদি কোন শুক্রকীটের সাথে তার মিলন না হয় তাহলে কিছুদিন পরে সেটা জরায়ু থেকে বেরিয়ে চলে যায় ঋতুস্রাবের সাথে। আর

যদি দুই কোষের মিলন হয় তাহলে মা হয়ে পড়েন গর্ভবতী— তার মানে, বুঝতে হবে বাচ্চা বড় হচ্ছে মায়ের পেটে।'

'বাবার শুক্রকীট রয়েছে তার অণ্ডকোষের ভেতর, সেটা মায়ের জরায়ুতে গিয়ে পৌঁছায় কি করে?'

'মায়ের যোনিপথে কীটগুলোকে ছেড়ে দেয় বাবা। অণ্ডকোষ থেকে একটা নালী বেয়ে শুক্রকীটগুলো চলে আসে বাবার লিঙ্গে। যেখান দিয়ে প্রস্রাব বেরোয়, সেই একই জায়গা দিয়ে শুক্রকীট বেরিয়ে আসে বাবার শরীর থেকে। মায়ের যোনিপথে লিঙ্গ ঢুকিয়ে যাতে ভ্রূণকোষের সাথে সহজেই মিলতে পারে সে জন্যে জরায়ুর কাছাকাছি অনেকগুলো শুক্রকীট ছেড়ে দেয় বাবা। একেই বলা হয় যৌন সঙ্গম বা যৌন মিলন। যোনিপথে ছেড়ে দেয়া শুক্রকীটগুলো নিজের থেকেই এগোতে থাকে জরায়ুর দিকে, যেখানে ডিম্বকোষ থেকে ভ্রূণকোষ গিয়ে শুক্রকীটের জন্য অপেক্ষা করার কথা। যদি বাবা আর মা এই দু'জনের দুটো কোষ একসাথে মিলতে পারে তাহলে দুটো মিলে এক হয়ে বাড়তে শুরু করে শরীরটা। যতই বড় হতে থাকে ততই স্পষ্ট আকার নিতে থাকে শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এই ভাবে বাড়তে বাড়তে নয় মাসে পুরোপুরি একটা বাচ্চার আকার ধারণ করে সেই এক হয়ে যাওয়া ভ্রূণকোষ আর শুক্রকীট। এই সময়টাকে বলে মায়ের গর্ভাবস্থা। জন্তু-জানোয়ারদের শরীরেও যখন তাদের

বাচ্চা বড় হয় সেই সময়টাকে বলা হয় গর্ভাবস্থা।'

'পেটের মধ্যে বাচ্চা না থাকলে গর্ভাবস্থা হয় না?'

'না। গর্ভধারণ করবার সময় থেকে নিয়ে বাচ্চার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত সময়টাকে বলা হয় গর্ভাবস্থা।'

'গর্ভধারণ কি?'

'বাবার শরীরের শুক্রকীট মায়ের শরীরের ভ্রূণকোষের সাথে মিলে এক হলেই গর্ভধারণ করা হল। তার মানে এখন থেকে বড় হতে শুরু করবে বাচ্চা।'

'আচ্ছা, মা, যমজ বাচ্চা হয় কি করে?'

'যমজ হয় যখন একই সাথে দুটো শুক্রকীট আর দুটো ভ্রূণকোষের মিলন হয়। দুটোই এক সাথে বেড়ে ওঠে তখন। কিংবা মায়ের ভ্রূণকোষ যদি দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে দুটো আলাদা অথচ সম্পূর্ণ শরীরে পরিণত হয়, তাহলে দুটোই বেড়ে উঠে যমজ বাচ্চার জন্ম হয়। লুসি, তুমি অমন ছটফট করছ কেন? কিছু জিজ্ঞেস করবে?'

'হ্যাঁ, মা, আমার কবে বাচ্চা হবে? হচ্ছে না কেন?'

'দশ বছর বয়সে তুমি মা হবে কি করে? বড় না হলে মা হওয়া যায় না। প্রথম দরকার বড় হওয়া, তারপর চাই বাচ্চার একটা বাবা। বাবা ছাড়া কোন বাচ্চা হতে পারে না। বড় হওয়া, বিয়ে করা ছাড়াও আরও অনেক প্রস্তুতি দরকার। যেমন, তুমি চাইবে তোমার বাচ্চা যেন ঠিকমত খাওয়া-

দাওয়া, কাপড়-চোপড় আর খেলনা পায়; তুমি চাইবে সে যেন লেখাপড়া শিখে সমাজে সম্মানের আসন লাভ করে। তাই না? এর জন্যে বাবা-মার প্রস্তুতি দরকার, টাকা পয়সার ব্যবস্থা দরকার, বাচ্চাদের মানুষ করে তোলার যোগ্যতা দরকার।'

'বাচ্চা হতে হলে সবাই হাসপাতালে যায় কেন?'

'সবাই যায় না। বাড়িতেও অনেকের বাচ্চা হয়। হাসপাতালে যাওয়ার সুবিধে এই যে সেখানে প্রয়োজনে ভাল ভাল ডাক্তার আর নার্সের সাহায্য পাওয়া যায়।'

'ছেলেমেয়ে হতে হলে বিয়ে আমাকে করতেই হবে? বিয়ে না করলে হয় না?'

'বিয়ে করাটাই নিয়ম। বিয়ে না করেও বাচ্চা হতে পারে, কিন্তু সেটাকে আমাদের সমাজে খুব খারাপ চোখে দেখা হয়। এর অনেক কারণ আছে। সবার ভালর জন্যেই নিয়ম করা হয়েছে বিয়ের। বিয়ে করে সংসার পাতে বাবা-মা, তোমাদের মত ফুটফুটে সুন্দর ছেলেমেয়ে এসে খুশির বন্যা বইয়ে দেয় সে সংসারে। জন্যেই তোমার বাবা-মা দু'জনেরই আদর পাচ্ছো, সেটাই খুব ভাল না?'

'সত্যি। আচ্ছা...আবেদার বাবা নেই কেন?'

'ছিলেন। মারা গেছেন।'

'আবেদার তো খুব কষ্ট, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, আবেদার মা যদি আরেকটা বিয়ে করেন তাহলেই তো আবেদা একটা বাবা পেয়ে যায়।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে। যদিও তিনি আবেদার আপন-বাবা হবেন না, তবুও তাঁকেই বাবা বলে ডাকবে আবেদা। আমাদের সমাজে স্বামী মারা গেলে আরেকটা বিয়ে করায় কোন বাধা নেই। আবেদার মা যদি আবার কাউকে বিয়ে করেন তাহলে আবেদা হবে তাঁর সৎ-মেয়ে, তিনি হবেন আবেদার সৎ-বাপ।'

'আর ওর মা হয়ে যাবেন সৎ-মা?'

'না। মা আপনই থাকবেন। ছেলেমেয়েদের বাবা যদি আরেকটা বিয়ে করেন তাহলে যাকে বিয়ে করে আনেন তিনি হন ছেলেমেয়েদের সৎ-মা।'

'বাবারা আরেকটা বিয়ে করেন কেন? মা মরে গেলে?'

'মা মরে গেলেও করতে পারেন, মায়ের সাথে কোন কারণে ঝগড়াঝাঁটি হয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও করতে পারেন, আবার মা থাকতেও অনেকে করেন।'

'তুমিও ইচ্ছে করলে এখন আর একটা বিয়ে করতে পারো?'

'এখন পারি না। যদি তোমার বাবার সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তাহলে পারি। আমাদের দেশে বহু বিবাহের প্রচলন এখনও রয়েছে। কিন্তু এটা পারে শুধু

পুরুষেরা। মেয়েরা এক স্বামী থাকতে আরেকটা বিয়ে করতে পারে না।'

'ঝগড়াঝাঁটি না করে মিলেমিশে থাকাই তো ভাল, তাই না, মা?'

'হ্যাঁ। সেটাই সবচেয়ে ভাল। তপু কিছু বলবে?'

'সৎ-মায়ের পেটের ভেতর আবার বড় হতে হয় সব ছেলেমেয়েদের?'

'না। একবার জন্ম হয়ে গেলে আর কারও পেটের মধ্যে যেতে হয় না।'

'সৎ-মায়ের পেটে আর বাচ্চা হয় না?'

'হতে পারে। তাদের বলা হয় সৎ-ভাই বা সৎ-বোন। তেমনি নিজের মায়ের পেটে যদি সৎ-বাপের ছেলেমেয়ে হয় তাদেরও বলা হয় সৎ-ভাই বা সৎ-বোন।'

'আচ্ছা, পেটের ভেতর থাকলে তো দেখা যায় না। কি করে বোঝো ছেলে হবে না মেয়ে হবে?'

'কিছুদিন আগেও জন্মের আগে সেটা বোঝার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে নির্ভুল ভাবে জানা যাচ্ছে কি হবে।'

'আচ্ছা, মা, ওই মস্ত কালো কুত্তাটা আমাদের স্যালির পিঠের ওপর লাফিয়ে ওঠে কেন? মারামারি করে?'

'না। মারামারি না। ওটা কুকুরদের যৌনমিলনের রীতি।'

'তাহলে ওরকম করে কেন? স্যালি ব্যথা পাবে না?'

'তোমার কাছে মারামারির মত মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে ওদের মধ্যে খুব ভাব। দু'জনই চাইছে দু'জনকে। ওটা ওদের রীতি। এই মিলনের ফলে হয়ত কয়েক মাস পর দেখবে ছোট্ট কয়েকটা বাচ্চা হয়েছে স্যালির। কালো কুকুরটাই হবে ওদের বাপ।'

'ওদের দু'জনের কি বিয়ে হয়েছে?'

'না। কুকুরেরা বিয়ে করে না, বাচ্চাদের জন্য ঘরও বানায় না। মানুষের বাচ্চাদের যেমন বড় হয়ে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে অনেক দেরি লাগে, কুকুরদের তা লাগে না। জন্ম হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই দিব্যি চলে ফিরে বেড়াতে পারে ওরা, কয়েক মাসের মধ্যেই নিজের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে নিয়ে নিজের দায়িত্ব নিজে নিয়ে স্বাধীন হয়ে যায়। সেই-জন্যে ওদের বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতবার দরকার হয় না।'

'পুষির বাচ্চাদেরও বাবা এই কালো কুকুরটা?'

'না। কুকুররা কখনও বিড়াল-ছানার বাবা হয় না। কুকুর হয় কুকুরের বাচ্চার বাবা, মানুষ হয় মানুষের বাচ্চার বাবা, তেমনি বিড়াল ছানার বাবা হচ্ছে হুলোবেড়াল। এক ধরনের প্রাণী অন্য ধরনের প্রাণীর বাবা-মা হয় না।'

'তুমি কি করে বোঝো তোমার কখন বাচ্চা হবে?'

'অনেকভাবে সেটা বোঝা যায়। তবে প্রথম লক্ষণ হচ্ছে

ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া। তারপর বাচ্চাটা যখন বেশ কিছুটা বড় হয়ে নড়াচড়া...'

'ঋতুস্রাব কি?'

'সাধারণত বারো থেকে চোদ্দ বছর বয়সে মেয়েদের শুরু হয় এটা। ঋতুস্রাব আর কিছুই না, জরায়ুর ধমনী থেকে স্বাভাবিক রক্তের ধারা।'

'ধমনী কি?'

'হৃৎপিণ্ড থেকে সারা শরীরে যে রক্তের নালীগুলো গেছে, সেগুলোকে বলে ধমনী।'

'তারপর বলো?'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার অর্থ বাচ্চা জন্ম দেবার ক্ষমতা অর্জন করেছে নারী। সাধারণত প্রতি আটাশ দিনে একবার করে ঋতুস্রাব হয় মেয়েদের, থাকে তিন থেকে পাঁচ দিন। রক্তের সাথে প্রতি মাসে, ধুয়ে বেরিয়ে যায় জরায়ুর আস্তরণ, তারপর আবার নতুন আস্তরণ তৈরি হয়। যৌনমিলনের ফলে যদি কেউ গর্ভবতী হয় তাহলে বন্ধ হয়ে যায় ঋতুস্রাব।'

'কেন? বন্ধ হয়ে যায় কেন?'

'এ রক্ত বাচ্চার বড় হওয়ার জন্যে দরকার হয় বলে পড়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।'

'সারাজীবন ঋতুস্রাব হতেই থাকে?'

'না। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে এক সময় বন্ধ হয়ে যায় ঋতুস্রাব। তখন আর সে গর্ভবতী হতে পারে না।'

'রক্তগুলো বেরোয় কি করে?'

'যোনিপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে। অনেকটা প্রস্রাবের মত।'

'রক্ত যে আসে জরায়ুটা জখম হয়ে কি করে?'

'জখম হয় না। এটা হাত পা কাটার মত ব্যাপার নয়। শরীরের বাড়তি কিছু স্বাভাবিক রক্ত বেরিয়ে যায় এইভাবে। অনেকক্ষণ দৌড়ালে যেমন ঘেমে যাও না?—তেমনি সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার।'

'ছেলেদেরও ঋতুস্রাব হয়?'

'না, ওদের কোনদিন ঋতুস্রাব হয় না। তুমি তো জানো, ঋতুস্রাব আসে জরায়ু থেকে, আর জরায়ু থাকে শুধু মেয়েদের শরীরে। ছেলেদের শরীরে জরায়ু থাকে না। তাই ওদের ঋতুস্রাব হয় না। কিন্তু মেয়েদের যখন ঋতুস্রাব শুরু হয়, অনেকটা সেই বয়সেই—অর্থাৎ, সাধারণত বারো থেকে চোদ্দ বছর বয়সে ছেলেদের বীর্যপাত শুরু হয়।'

'এটা আবার কি জিনিস? রক্ত?'

'না, এটা রক্ত না।'

'বেরোয় কোথা দিয়ে? থাকে কোথায়?'

'থাকে অণ্ডকোষে। সেখান থেকে নালী দিয়ে এসে লিঙ্গের

মুখ দিয়ে বেরোয়।'

'বারো বছরের আগে আমার কিছুতেই ঋতুস্রাব হবে না?'

'সময়টা ধরা হয় বারো থেকে চোদ্দ বছর বয়স, কিন্তু কারও কারও আগেই শুরু হয়ে যায়, কারও আবার পনেরো-ষোলোতেও শুরু হতে পারে—ঠিক নেই। এটা ভয়ের কোন ব্যাপার না। সব মেয়েরই হয়। কাপড় যাতে রক্তের দাগ লেগে নষ্ট না হয় সেজন্য ওই সময়টায় সবাই কাপড় বা তুলোর প্যাড ব্যবহার করে। সর্দি লাগলে মানুষ যেমন রুমাল ব্যবহার করে, সেই রকম।'

'ছেলেরাও প্যাড ব্যবহার করে?'

'না, ওদের প্যাড ব্যবহার করবার দরকার হয় না। ওদেরটা পরিমাণে খুব কম হয়, তাছাড়া রঙও লাল হয় না—তাই জামা-কাপড় নষ্ট হওয়ার তেমন কোন ভয় থাকে না।'

'আচ্ছা, ছেলেদের মোসলমানি করতে হয় কেন?'

'সবাইকে করতে হয় না। পৃথিবীতে অনেক জাতি আছে যাদের মধ্যে এই নিয়মের প্রচলন নেই। মুসলমানদের জন্যে এটা সুন্নত।'

'লিঙ্গটা কেটে ফেলে দেয়?'

'নারে, না। লিঙ্গের আগা থেকে বাড়তি খানিকটা চামড়া শুধু কেটে ফেলে দেয়া হয়।'

'তাতে কি লাভ হয়?'

'এর ফলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে লিঙ্গ। বাড়তি চামড়াটুকু কেটে বাদ দিয়ে দেয়ায় ওর নিচে ময়লা বা রোগ জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না।'

'আচ্ছা মা, বড়দের গায়ে লোম থাকে, আমাদের গায়ে নেই কেন?'

'গায়ের লোম হওয়াটা বড় হওয়ার একটা স্বাভাবিক লক্ষণ। ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয় তখন অনেক রকম পরিবর্তন হয় তাদের শরীরে। মেয়েদের স্তন বেড়ে ওঠে, যাতে বাচ্চা হলে তাকে দুধ খাওয়ানো যায়। ছেলেদের গলার স্বর ভারি হয়ে যায়, মুখে দাড়ি-গোঁফ গজায়। এই সবই স্বাভাবিক পরিবর্তন, প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার লক্ষণ। বগলের নিচে, লিঙ্গ বা যোনিপথের আশপাশে লোম গজায়। বেশির ভাগ পুরুষের বুকেও লোম গজায়। তোমরা বড় হলে তোমাদের গায়েও লোম হবে।'

'কত বছর বয়স হলে?'

'ঋতুস্রাব আর বীর্যপাতের বয়স হলেই শুরু হবে।'

'বুড়ো হলে ঝরে যাবে?'

'কিছুটা হালকা হতে পারে, কিন্তু ঝরে যাবে না।'

'আচ্ছা, কি যেন বলছিলে তুমি—ও, হ্যাঁ, কি করে বোঝা যায় কখন বাচ্চা হবে?'

'গর্ভসঞ্চার হলেই ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, কারণ রক্তগুলো

তখন দরকার হয় পেটের বাচ্চাটার বেড়ে ওঠার কাজে। তখন থেকে হিসেব করলে কবে বাচ্চার বড় হয়ে বেরিয়ে আসবার সময় হবে বোঝা যায় অনেকটা। এর চেয়েও সহজ আরেকটা নিয়ম আছে। পেটের ভিতর বাচ্চাটা যখন বেশ একটু বড় হয়ে নিজের থেকেই নড়াচড়া করতে শুরু করে, মায়েরা টের পায়। তখনই ধরে নেয়, দুই একদিন এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু তখন থেকে ঠিক পাঁচ মাসের মাথায় জন্ম নেবে বাচ্চাটা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মিলে যায় এই হিসেব।'

'আচ্ছা, মাসিক কি এই ঋতুস্রাবকেই বলে?'

'এই শব্দটা আবার শিখলে কোথায়?'

'আবুলের মা বলছিল পাশের বাসার চাকরানীকে।'

'ঋতুস্রাবকে মাসিকও বলে অনেকে। প্রায় এক মাস পর পর এই ব্যাপারটা ঘটে বলে কথাটার প্রচলন হয়েছে। তবে এই শব্দটা ওই অর্থে ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ মাসিক শব্দটা আমরা আরও অনেক ব্যাপারে ব্যবহার করি, যেমনঃ মাসিক বেতন, মাসিক পত্রিকা, মাসিক ভাড়া, মাসিক চাঁদা, ট্রেনের মাসিক টিকিট, মাসিক ইলেকট্রিক বিল। যা বলতে চাও সেটা পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হলে যেসব শব্দে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে সেসব ব্যবহার না করে আসল নামটাই ব্যবহার করা ভাল।'

'সেদিন আব্বা ছোট চাচাকে বলছিল, কাকে নাকি

জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ আপনি কি বাংলাদেশের ন্যাচারাল বর্ণ সিটিজেন? সে উত্তর দিয়েছিলঃ না, সিজারিয়ান। এই বলে দু'জনে হো হো করে হাসল, আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। সিজারিয়ান কি?'

'এর মানে হচ্ছে লোকটার জন্ম আর সবার মত স্বাভাবিকভাবে হয়নি। সবার মত জরায়ু থেকে বেরিয়ে যোনিপথ বেয়ে বাইরে আসেনি সে, সিজারিয়ান অপারেশন করে বের করা হয়েছে তাকে মায়ের পেট থেকে। রোমসম্রাট জুলিয়াস সিজারের নাম থেকে এসেছে সিজারিয়ান শব্দটা। যদিও কেউ হলপ করে বলতে পারে না, তবু মানুষের ধারণা এইভাবে জন্ম হয়েছিল জুলিয়াস সিজারের।'

'এতে হাসির কি আছে, মা?'

'তোমার আব্বা আর চাচা হেসেছে অন্য কারণে। আসলে সেই লোকটাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল বাংলাদেশেই তার জন্ম হয়েছিল, নাকি অন্য কোন দেশ থেকে এসে বাংলাদেশের নাগরিক হয়েছে। সে প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে ভেবেছে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে জন্মটা তার কিভাবে হয়েছে, স্বাভাবিক, না অস্বাভাবিক।'

'আচ্ছা, মা, রোজ রোজ রেডিও আর টেলিভিশনে যে জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলে সেটা কি জিনিস? লাইগেশন, ভ্যাসেকটমি, কনডোম, প্লাস্টিক কয়েল, আরও কি কি সব

বলে—ওসব কি? ওরা বার বার করে বলে কেন?'

'জনসংখ্যা আমাদের দেশের মস্ত বড় একটা সমস্যা। দিন দিন আরও লোক বেড়ে যাচ্ছে। অবস্থা একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই তাই রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ আর রঙিন পোস্টারের সাহায্যে সরকার সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছেন, পরামর্শ দিচ্ছেন জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে।'

'বেশি লোক হলে ক্ষতি কি?'

'লোক যত বেশি বাড়ছে সেই তুলনায় আমাদের টাকা-পয়সা বা খাবার-দাবার বাড়ছে না। তাই বেশি লোক হয়ে গেলে আমাদের একবেলা খেয়ে থাকতে হবে, আরও বেশি হলে একবেলাও জুটবে না। তাছাড়া এখন বেশি ছেলেমেয়ে হওয়ার তেমন দরকারও তো নেই। আগের দিনে মানুষের বারো চোদ্দটা ছেলেমেয়ে হত ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে থেকে বাঁচত বড়জোর দু'চারটে। বুড়ো মানুষেরাও খুব তাড়াতাড়ি মরে যেত। কিন্তু এখন চিকিৎসা বিজ্ঞান এত এগিয়ে গেছে, এতসব জটিল রোগের ওষুধ বেরিয়ে গেছে যে মানুষের মৃত্যুর হার কমে গেছে অনেক, বাচ্চাও বেশি মরছে না, বুড়োরাও না। এখন যে কোন সংসারে দুটি ছেলেমেয়ে হলে আশা করা যায় দুইজনই বেঁচেবর্তে থাকবে, মানুষ হবে। কাজেই বেশি ছেলেমেয়ের দরকার নেই এখন আর। ছেলেমেয়ে বেশি হলে

মায়ের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়, সবার প্রতি যত্ন নেয়া সম্ভব হয় না, সবাইকে ভালভাবে মানুষ করা যায় না। তোমার আব্বা যা বেতন পান সেই টাকায় আমরা চারজন যেমন খাচ্ছি পরছি, আরও চারজন থাকলে কি সেই ভাবে চলতে পারতাম? পারতাম না। সেটা ক্ষতি নয়?'

'এই জন্যই বলেঃ ছোট পরিবার সুখী পরিবার?'

'হ্যাঁ। আমাদের পরিবার যদি আরও বড় হত এটাকে আর সুখী পরিবার বলা যেত না। আগে সম্ভব ছিল না, কিন্তু এখন যখন আমরা ইচ্ছে করলেই বাচ্চার জন্ম ঠেকিয়ে দিতে পারি, সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার কেন করব না?'

'ঠেকিয়ে দেয়া যায় কি করে?'

'কয়েক রকম নিয়ম আছে, যার যেমন খুশি সে সেই নিয়ম ব্যবহার করে। সব পদ্ধতিরই মূল কথা হচ্ছেঃ বাবার শুক্রকীটের সাথে মায়ের ভ্রূণকোষের মিলন বন্ধ করা। মা কিংবা বাবা যে কোন একজন ব্যবস্থা নিলেই এই মিলন বন্ধ করে দেয়া যায়। পুরুষদের জন্য রয়েছে কনডোম ব্যবহার বা ভ্যাসেকটমির ব্যবস্থা, মেয়েদের জন্যে রয়েছে পিল খাওয়া, প্লাস্টিক কয়েল ব্যবহার করা, লাইগেশন করিয়ে নেয়া, ইত্যাদি। সরকার জনসাধারণকে এই সব পদ্ধতি ব্যবহার করবার পরামর্শ দিচ্ছে, বার বার করে সাবধান করছে, বেশি বাচ্চা হওয়ার কুফল সম্পর্কে প্রচার চালাচ্ছে—তাই শুনতে

শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে তোমাদের শব্দগুলো।'

'সেদিন কাগজে দেখলাম একটা মেয়েকে একজন লোক ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণ কি?'

'এটা একটা মারাত্মক অপরাধ। কোন পুরুষ যদি কোন মেয়েকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গায়ের জোরে তার সাথে যৌনমিলনে বাধ্য করে, সেটাকে বলে ধর্ষণ।'

'আর অবৈধ সন্তান?'

'যেসব সন্তানের মা-বাবার মধ্যে বিয়ে হয়নি তাদের অবৈধ বা জারজ সন্তান বলে। অবৈধ সন্তান পারিবারিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বাবার বিষয়-সম্পত্তি কিছুই পায় না।'

'তাহলে তো তাদের খুব কষ্ট হয়। কিন্তু, মা, বিয়ে না করলেও বাচ্চা হয় কেন?'

'বাবার শুক্রকীট আর মায়ের ভ্রূণকোষের মিলন হলে মায়ের জরায়ুতে বেড়ে ওঠে। বিয়ে না হলেও এটা ঘটতে পারে বাবা-মার ভুলে বা দোষে। অবৈধ সন্তান সমাজে স্থান পায় না, তাদের কপালে অনেক দুঃখ কষ্ট আর দুর্ভোগ থাকে, সেটা জানার পরও যদি কেউ বিয়ের আগে যৌনমিলন ঘটতে দেয় এবং তার ফলে যদি মায়ের পেটে বাচ্চা আসে—সেটা খুবই খারাপ কথা, তাই না?'

'তাই তো। বাচ্চাটা তো কোন দোষ করেনি।'

'ঠিক বলেছ। বাচ্চার কোনই দোষ নেই। বাবা-মার দোষে কষ্ট পায় সে।'

'এই দোষটা বাবা-মা করে কেন?'

'বেশির ভাগ বাবা-মাই করে না। দুই-একজন যারা করে বসে, তারা হয় এর পরিণতির কথা জানে না, নয়ত জেনেও সন্তানের কষ্টটাকে বড় করে দেখে না নিজেদের বুদ্ধির দোষে। যৌনমিলনে বাবা-মা দু'জনই সাময়িক আনন্দ অনুভব করে। যারা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে, গর্ভসঞ্চার হয়ে গেলে যে সন্তান হবে তার মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা না ভেবে এই ক্ষণিক আনন্দকেই বড় করে দেখে তাদের কোন নীতিবোধ বা দায়িত্বজ্ঞান নেই। আমাদের সমাজে এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞান-হীন মানুষকে খুব খারাপ চোখে দেখা হয়। সবাই তাদের ছি ছি করে।'

জননেন্দ্রিয়

লিঙ্গের আকার

নিজ লিঙ্গের আকার নিয়ে সঁন্তুষ্ট এমন পুরুষ বিরল। ঠিক কতটা লম্বা এবং কতখানি মোটা হওয়াটা স্বাভাবিক, তার নিজেরটা স্বাভাবিক কিনা, তা নিয়ে মাথা ঘামায় প্রত্যেক পুরুষ জীবনের কোন না কোন সময়ে। ধরে নিচ্ছি, তুমি মাথা ঘামাচ্ছ এ নিয়ে।

প্রকাণ্ড লিঙ্গের অধিকারী হওয়াটা মস্ত পৌরুষের লক্ষণ, আর তার বিপরীত হলেই পৌরুষের অভাব, এরকম একটা ধারণা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। ফলে এ ব্যাপারে একটা দুর্বলতা থেকে যায় সব পুরুষের ভিতরেই। অপর কোন পুরুষকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখার সুযোগ হলে প্রত্যেক পুরুষের চোখ সবচেয়ে আগে যাবে তার লিঙ্গের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে মনে মনে তুলনা হয়ে যাবে তার নিজেরটার সঙ্গে। নিজের

চেয়ে বড় লিঙ্গ দেখলে আশ্চর্য এক হীনমন্যতা এসে যায় প্রায় সব পুরুষের মধ্যেই, ছোট দেখলে নিজেকে মনে হয় পুরুষ বটে। অনেক জটিল মানসিক রোগ হয়ে যায় অনেকের এসব থেকে।

এই কৌতূহল এবং তুলনার মনোভাব জন্ম নেয় অতি শৈশবেই। এই সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তুমি হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিলে। কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করায় ধিনতাধিনাক নাচতে নাচতে বললে, 'হো হো, কী মজা, দেখে ফেলেছি।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল আমার। 'কি দেখেছিস, শয়তান?'

বললে, 'হি হি হি হি, লম্বা মত...বড় একটা...গোল গোল...দাড়ি মোচ আছে।'

খিলখিল করে হেসে উঠল তোমার মা-ও। 'ঠিক হয়েছে। দেখলে এবার? যেমন বে-আক্কেল বে-হুঁশের মত ঘুমাও...ঠিক হয়েছে!'

শুধ তুমি না, সব শিশুই কোন না কোন ফাঁকে দেখে ফেলে তার বাপের লিঙ্গ। জিনিস একই, কিন্তু আকারের যে বিরাট তারতম্য, সেটা কচি মনের উপর গভীরভাবে ছায়া ফেলে। বয়স বাড়লে তার নিজেরটার আকারও বৃদ্ধি পায় ঠিকই, কিন্তু কৌতূহলী শিশুর চোখে দেখা তার পিতার প্রকাণ্ড লিঙ্গের ছবি রয়ে যায় মনের মধ্যে। বড় হয়ে মেপে দেখবার সুযোগ না থাকায় সন্দেহ থেকে যায়, নিশ্চিত হতে পারে না তারটা পিতার সমান হয়েছে কিনা। মনে করে তারটা ছোট।

ক্লাস টু-থ্রীতে পড়বার সময় বাঘের মত ভয় পেতাম আমাদের নলিনী স্যারকে। মিশমিশে কালো প্রকাণ্ড এক দৈত্য মনে হত তাঁকে। পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেত। নিজেকে ছোট্ট পুতুলের মত মনে হত তাঁর পাশে। বড় হয়েও সেই চিত্রটাই রয়ে গিয়েছিল মনের মধ্যে। হঠাৎ এই সেদিন স্যারের সাথে রাস্তায় দেখা। দেখলাম, দৈত্য দানব কিছু নয়, আমার কাঁধ সমান উঁচু নিতান্ত গোবেচারা এক নিপাট ভদ্রলোক। ছোটবেলার কচি চোখের দেখায় আমার ভুল ছিল। সবারই তাই থাকে।

আসল ব্যাপার কি জানো, লিঙ্গের আকার নিয়ে মাথা ঘামানো নেহায়েত বোকামি। কোন রকম বিশেষ ব্যায়াম করে বা তেল মালিশ করে কোন লাভ নেই। যৌন অঙ্গের আকার বংশগত বৈশিষ্ট্য—যারটা যেমন তার তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অসন্তুষ্টিরও কোন যৌক্তিকতা দেখতে পাই না, কারণ নারীকে সঙ্গমে চরম-সুখ দিতে পারাটা লিঙ্গের আকারের উপর নির্ভর করে না। জননেন্দ্রিয়ের প্রথম দুই থেকে আড়াই ইঞ্চির মধ্যেই নারীর যৌন সুখানুভূতির প্রায় সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। এটুকু পৌঁছতে অশ্ব-লিঙ্গের প্রয়োজন পড়ে না। উদ্রিক্ত অবস্থায় তিন ইঞ্চি লম্বা হলেই যথেষ্ট। আর মোটা? হাতের আঙুলের সমান মোটা হলেই কাজ চলে। আসলে সঙ্গমের ক্ষেত্রে সরু-মোটা তেমন কোন ধর্তব্যের বিষয় নয়।

বিদেশে প্রচুর গবেষণার পর স্থির হয়েছে উদ্রিক্ত অবস্থায় সাড়ে চার ইঞ্চি থেকে সাড়ে ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত দীর্ঘ লিঙ্গকে স্বাভাবিক আকারের লিঙ্গ বলা যায়।

কাজেই তোমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তুমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কেন
কি হয়

লিঙ্গের চামড়ার নিচে অনেকগুলো ছোট পকেট আছে, রবারের বেলুনের মত। প্রত্যেকটা পকেটের সাথে কয়েকটা রক্তনালীর যোগ রয়েছে। পকেটের মধ্যে রক্ত আসা এবং যাওয়ার জন্যে আলাদা পথ রয়েছে। অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই অঙ্গে মৃদু ঘর্ষণ হলে কিংবা মনে যৌন চিন্তা এলে দেখা যায় এটার আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা ঘটে অভ্যন্তরীণ স্নায়বিক কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশে। উত্তেজনা হলেই খবর আদান-প্রদান শুরু হয়ে যায় লিঙ্গ, মেরুদণ্ড আর মস্তিষ্কের মধ্যে। ইঙ্গিত পেলেই পকেটগুলোর একদিকের পথ খুলে যায় এবং রক্ত এসে প্রবেশ করে সেখানে। এর ফলে লিঙ্গের পেশীর উপর চাপ পড়ে এবং শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় সেটা। উত্তেজনা অনুযায়ী শরীরের ভিতর থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয় এই রক্ত চলাচল, বাড়তি রক্ত বের করে দেয়া হয় পকেটগুলোর অন্য দ্বার দিয়ে।

যোনিপথে ঢুকিয়ে এই উদ্রিক্ত লিঙ্গকে সামনে-পিছনে

করলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে স্নায়বিক উত্তেজনা। সুখানুভূতির স্রোত বইতে শুরু করে লিঙ্গ-মেরুদণ্ড-মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ড-লিঙ্গ উভয় দিকে। উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পেতে যখন চরমাবস্থায় পৌছে যায়, তখন আর সহ্য করতে পারে না স্নায়ুতন্ত্রীগুলো—প্রচণ্ড এক স্নায়বিক বিস্ফোরণ ঘটে শরীরের অভ্যন্তরে। এবং কয়েক ঝাঁকুনিতে পাঁচ-ছয় দফায় বেরিয়ে আসে প্রায় পঞ্চাশ কোটি শুক্রকীট কোয়ার্টার আউন্স বীর্যের সাথে। এরপর বেশ দ্রুত পকেটগুলোর নিষ্কাশন পথ দিয়ে বেরিয়ে যায় রক্ত। আবার আগের অবস্থায় ফিরে গিয়ে শান্তশিষ্ট রূপ ধারণ করে জিনিসটা।

যতটা সহজ ভাবে বলা হল, ব্যাপারটা ঠিক ততটা সহজ নয়। কেবল বীর্য-স্খলন করতে পারলেই পরিপূর্ণ সঙ্গম সুখ হয় না। আরও অনেক কিছু রয়েছে এর মধ্যে। কিন্তু সে-সব কথায় পরে আসছি। তার আগে সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখা যাক যৌন-অক্ষমতা বলতে কি বোঝায়।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সঙ্গমে অক্ষম পুরুষ পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী ব্যক্তি। শতকরা একশো জন পুরুষই জীবনের কোন না কোন সময়ে যৌন বিপত্তিতে ভুগে থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আপনা-আপনি বা সামান্য চিকিৎসায় দূর হয়ে যায় অসুবিধা। সহজে সারতে চায় না, কিছুদিন পরপর বা দীর্ঘকাল ধরে একটানা যৌন বিভ্রাটে ভোগে শতকরা

তিরিশ জন। দুর্বিষহ জীবন যাপন করে এই হতভাগ্যের দল।

সাধারণত যৌন অক্ষমতার চারটি প্রকার ভেদ করা হয়ে থাকে। প্রথম, যাদের লিঙ্গোদ্রেক হয় না, কিংবা যখন দরকার তখন হয় না কিন্তু অন্য সময় যখন তখন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়, যাদের শক্ত হয়ে দাঁড়ায় ঠিকই, এবং যোনিপথে প্রবেশও করে ভদ্রলোকের মত, কিন্তু কাজ শুরু করতে গেলেই নরম হয়ে যায় তুলোর মত। তৃতীয়, যাদের লিঙ্গ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, হয়ত যোনিপথে প্রবেশ করে কাজও শুরু করে, কিন্তু শুরু করার সাথে সাথেই ঘটে যায় বীর্যপাত—ফলে চরম লজ্জায় পড়তে হয় অতৃপ্ত সঙ্গিনীর কাছে। চতুর্থ, যাদের সবই ঠিক আছে, কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা চেষ্টার পরও কিছুতেই বীর্য-স্খলন হয় না, কিছুতেই চরমানন্দ ঘটে না এদের কপালে।

এ সমস্যা আজকের নয়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এর প্রতিকার খোঁজার চেষ্টা করছে। ওষুধ তৈরি করবার চেষ্টা করেছে, যন্ত্রপাতি তৈরি করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুতেই তেমন কিছু কাজ হয়নি। জাপানের তৈরি একটা যন্ত্র বেশ নাম করেছিল এক সময়। ছোট একটা ট্রাঞ্জিস্টার রেডিওর মত দেখতে যন্ত্রটা। দুটো বৈদ্যুতিক তার বেরিয়ে এসেছে সেট থেকে। দুই তারের মাথায় দুটো বিশেষ ভাবে তৈরি ধাতব জিনিস, একটা আটকে দিতে হয় লিঙ্গের গোড়ায়, অপরটা

ঢুকিয়ে দিতে হয় গুহ্যদ্বারে। বিদ্যুৎ চালু করে দিলে সাথে সাথে যে-কোন অক্ষম লিঙ্গ উঠে দাঁড়াতে বাধ্য।

কিন্তু কোন যন্ত্রের সাহায্যেই স্বাভাবিক সঙ্গম-সুখ লাভ করা সম্ভব নয়, তা সে যত উন্নত মডেলের যন্ত্রই হোক না কেন। এই সমস্যার সমাধান যন্ত্রপাতি বা বীর্যবর্ধক ওষুধপত্রে নেই। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দিয়েছেন, নামমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সঙ্গমে অক্ষমতা আদৌ কোন শারীরিক ব্যাধি নয়। মানসিক ব্যাধি। রোগটা লিঙ্গে নয়, মাথায়। উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করলে সেরে উঠতে পারে শতকরা পঁচানব্বই জন রোগী।

নারীর চরমানন্দ

বহু বছর আগে বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ সিগমণ্ড ফ্রয়েড পৃথক দুই প্রকার যৌন তৃপ্তি সম্পর্কে যে ভুল মতবাদ প্রচার করেছিলেন, আজও দেখতে পাই সেটাই চালু রয়েছে আমাদের দেশী যৌন শিক্ষা বিষয়ক বেশির ভাগ বই পুস্তকে। ফ্রয়েডের ধারণা ছিল দুই রকমের চরমানন্দ লাভ করে মেয়েরাঃ ক্লাইটরিস অর্গাজম্ এবং ভেজিনাল অর্গাজম্। তাঁর মতে ভগাঙ্কুরজনিত সুখ অল্প বয়সের হস্ত মৈথুনের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে অপরিণত এবং পরিত্যাজ্য, আর যোনিপথে সঙ্গমজনিত যে সুখ, সেটা পরিণত এবং বেশি আনন্দদায়ক।

এই বক্তব্যটিকে কোনরকম পরীক্ষা ব্যতিরেকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলেন সেকালের পণ্ডিতেরা, ফলে বহুদিন পর্যন্ত চালু ছিল এই ভুল ধারণা। অল্প কিছুদিন আগে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেছে আসল ব্যাপারটা।

জানা গেছে, ভগাঙ্কুরই হচ্ছে নারীর যৌনানুভূতির কেন্দ্রবিন্দু। যৌন সুখের শুরু ও শেষ এখানেই। একে বাদ দিয়ে নারীর চরমানন্দ লাভ সম্ভব নয়। ভগাঙ্কুরকে না জানিয়ে যোনিপথের সঙ্গমে তৃপ্তি লাভ করা অনেকটা জিভকে না জানিয়ে ভোজন সুখ লাভ করার মতই অসম্ভব ব্যাপার।

আসলে সঙ্গমের সময় ভগাঙ্কুর সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে না। অসংখ্য সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রী নেমে এসেছে ভগাঙ্কুর থেকে ভগাধার লঘু, ভগালিন্দ এবং যোনি-রন্ধ্রে। যোনিপথে লিঙ্গের চলাচল শুরু হলে ল্যাবিয়া মাইনরিয়া বা ভগাধার লঘুতে টান পড়ছে, সেই টানে মৃদু টান পড়ছে ভগাঙ্কুরেও, স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেজিত হয়ে উঠছে ভগাঙ্কুর উত্তরোত্তর। সুখানুভূতির খবর আদান-প্রদান শুরু হয়ে গেছে যৌনাঙ্গ, মেরুদণ্ড আর মস্তিষ্কের মধ্যে। উত্তেজিত হয়ে উঠছে স্নায়ুতন্ত্রীগুলো ক্রমেই। বাড়ছে হৃৎপিণ্ডের গতি, ব্লাড প্রেশার, হাঁপাতে শুরু করছে নারী। তীব্রতর হয়ে উঠছে সুখানুভূতি। শেষ পর্যায়ে গিয়ে আর সহ্য করতে পারে না স্নায়ুগুলো, প্রচণ্ড এক স্নায়বিক বিস্ফোরণের ফলে যৌনাঙ্গের আশপাশের পেশীগুলোর মধ্যে খিঁচুনির মত প্রবল এক সংকোচন-প্রসারণ শুরু হয়ে যায়। চরম মুহূর্তে অবর্ণনীয় এক আনন্দের শিহরণ ছড়িয়ে পড়ে নারীর সারা শরীরে। এই হল মোটামুটি নারীর চরমানন্দের রূপ। ভগাঙ্কুর জনিত আনন্দ হচ্ছে, না যোনিপথ জনিত আনন্দ

হচ্ছে সেসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

সঙ্গিনীর পূর্ণ পরিতৃপ্তির দিকে প্রত্যেক পুরুষের নজর দেয়া দরকার, সবাই জানে। এটা দু'জনের খেলা, এমন অদ্ভুত খেলা যে কেউ হারলে চলবে না, জিততে হবে দু'জনকেই। একজন যদি বরাবর জিততে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত হার হয়ে যায় দু'জনেরই। কাজেই দু'জনকেই আনন্দ পেতে হবে। পুরুষের বেলায় চরমানন্দ হল কি হল না বুঝতে পারে মেয়েরা অতি সহজেই, কিন্তু মেয়েদের বেলায় বুঝবার উপায় কি? এমন কোন লক্ষণ আছে, যা দেখে সঙ্গিনীকে জিজ্ঞেস না করেও টের পেতে পারে পুরুষ তার চরমানন্দ ঘটেছে কি ঘটেনি?

সব নারীই জানে, পুরুষ 'হ্যাঁ' শুনতে ভালবাসে। তৃপ্তি হোক বা না হোক 'হ্যাঁ' বলতে দ্বিধা করে না মেয়েরা। কারণ, 'না' শুনলে পিন ফোটানো বেলুনের মত চুপসে যায় পুরুষের পৌরুষ; হীনমন্যতা ও অশান্তিতে ভোগে, মনে করে ছোট হয়ে গেল সে সঙ্গিনীর চোখে—তাই ছোট্ট একটুকরো মিথ্যে কথা বলে দেয় তারা অক্লেশে।

কিন্তু সত্যানুসন্ধানী পুরুষের জন্যে দুটো পথ আছে। বেশির ভাগ নারীর বুকে ঘামের মত এক রকম অতি ক্ষুদ্র দানা ওঠে চরমানন্দ লাভের পর মুহূর্তে। কয়েক মিনিট পর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় সেটা। সবার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা যে

ঘটবেই এমন নয়, কিন্তু দ্বিতীয়টা ঘটতেই হবে। চরমানন্দ ঘটলে প্রত্যেক নারীর স্তনের বোঁটা শক্ত হয়ে যেতে বাধ্য। ফোঁস ফোঁস হাঁপানি, অস্ফুট গোঙানি, জাপটে ধরা, যোনিপ্রদেশের পেশী সংকোচন-প্রসারণ, আর পাগলের মত কোমর সঞ্চালনের পরও যদি দেখা যায় স্তনের বোঁটা দাঁড়ায়নি, বুঝতে হবে, তৃপ্তি হয়নি নারীর।

সঙ্গম

সঙ্গমের উদ্দেশ্য

সাধারণত তিনটি উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষ সঙ্গমে লিপ্ত হয়—সন্তান উৎপাদন, গভীর স্বর্গীয় প্রেমের প্রকাশ, আর নিছক দৈহিক আনন্দ।

সবচেয়ে সহজ হচ্ছে প্রজননের জন্য সঙ্গম। এ-জন্যে তেমন বিশেষ কোন যৌন-জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। কোন মতে নারীর যোনিপথে লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে বীর্য-স্খলন করতে পারলেই হয়।

নারী-পুরুষের অন্তরের গভীর প্রেমের প্রকাশ হতে পারে সঙ্গমের মাধ্যমে। সব কথা যখন ফুরিয়ে যায়, অথচ মনটা আকুলি-বিকুলি করে আরও গভীর ভাবে আরও কিছু জানাবার জন্যে, আর সব প্রকাশ-মাধ্যমের ক্ষমতা যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখানে সঙ্গমের মাধ্যমে দুটি মন, দু'টি প্রাণ, দু'টি দেহ নিবিড় ভাবে এক হয়ে পরস্পরকে জানাতে পারে—তোমায়

ভালবাসি। সযত্নে লালন করলে নারী-পুরুষের এই ভালবাসা বহু দিন বজায় রাখা সম্ভব। যত্ন না পেলে খুব অল্পদিনেই শুকিয়ে ঝরে যাবে প্রেমের ফুল। ব্যাপারটা দুঃখজনক হলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে অকালেই মৃত্যু ঘটে এ প্রেমের।

বাকি রইল নিছক আনন্দের জন্যে সঙ্গম। এখানে প্রজনন বা প্রেম মুখ্য নয়, নিছক দৈহিক তৃপ্তিই মুখ্য ও প্রধান কথা। প্রজননের জন্যে সঙ্গম, বড়জোর প্রেমের জন্য সঙ্গম পর্যন্ত সহজ স্বীকৃতি পেয়েছে আমাদের সমাজে—আনন্দের জন্যে সঙ্গমকে লালসা বা কুৎসিত দৈহিক কামনা হিসেবে দেখতে শেখানো হয়েছে আমাদের। নারী-পুরুষের যৌনমিলন যে অত্যন্ত আনন্দজনক এক খেলা সে-ব্যাপারে খুব একটা সন্দেহের অবকাশ নেই। কেন যে এর মধ্যে এই অন্যায় বোধটা ঢুকল সেটা রীতিমত গবেষণার বিষয়। তবে তুমি জেনে রেখো, যে যা-ই বলুক, শিল্প ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক রুচিবানেরা যে যা-ই ভাবুক, দৈহিক আনন্দের জন্যে সঙ্গমে কোন অন্যায় নেই। —??!

ধর্ষণ নিঃসন্দেহে অন্যায়। অন্যের স্ত্রী বা স্বামীর সাথে সঙ্গম বে-আইনী এবং বিপজ্জনক। সম-কাম অস্বাভাবিক এবং প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করে বলে পরিহার্য। কাজেই এসব থেকে সাবধান থাকবে। কিন্তু সঙ্গমের আনন্দের মধ্যে

পাপবোধ বা রুচির উন্নাসিকতা ঢুকাতে যেয়ো না। দৈহিক আনন্দে অন্যায়ের কিছুই নেই। তবে একটা ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। প্রেমহীন দৈহিক মিলনে উভয়ের চরমানন্দই মুখ্য কথা। এক্ষেত্রে প্রেমের চোখে তোমার দোষ-ত্রুটি-অপটুত্ব উপেক্ষা করবে না তোমার সঙ্গিনী। আসল উদ্দেশ্য এখানে আনন্দ পাওয়া ও দেয়া। এই দেয়া-নেয়ার সবচেয়ে বড় বাধা যেটা, সেটা হচ্ছে জ্ঞানের অভাব। কাজেই তোমার জেনে নিতে হবে কিসে কি হয়, কেন হয়; কিভাবে হয়। জেনে নিতে হবে কিভাবে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়া ও নেয়া যায় এ থেকে।

এজন্যে প্রথমেই জানা দরকার, যৌনাঙ্গে যে অনুভূতি হচ্ছে সেটা আসলে অনুভব করছ তুমি তোমার মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ককে বাদ দিলে শরীরের কোথাও কিছু অনুভব করা সম্ভব নয়। কাজেই এই মস্তিষ্কের ওপর যদি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারো, একমাত্র তাহলেই তুমি সঙ্গমের পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও সুখ লাভ করতে পারবে। সঙ্গিনীকেও তৃপ্ত ও সুখী করতে পারবে।

সঙ্গমে তৃপ্তি

সঙ্গমকালে মুখ্য অংশ গ্রহণ করে পুরুষের লিঙ্গ এবং নারীর ভগাঙ্কুর, যোনিপথ ও সংশ্লিষ্ট এলাকা। কিন্তু শুধু এদের ওপর নির্ভর করলে তৃপ্তির গভীরতা বা পরিপূর্ণতা আসে না। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে হয় সঙ্গমের আগে। চরমানন্দের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করতে হলে দৃষ্টি, ঘ্রাণ, শ্রবণ, স্বাদ, স্পর্শ—সবক'টা ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাতে হবে। বিশেষ করে যৌনাঙ্গে চুম্বন ও অবলেহনের উপর আধুনিক যৌন-বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব আরোপ করছেন।

ভগাঙ্কুরকে জিভ দিয়ে লেহন করাকে ইংরেজিতে বলা হয় cunilingus, আর লিঙ্গকে লেহন করাকে বলে fellatio। আমরা এগুলোকে যথাক্রমে ভগাঙ্কুর-লেহন ও লিঙ্গ-লেহন বলতে পারি। এরচেয়ে সুখকর শৃঙ্গার আর নাই। এর ফলে স্নায়ুগুলো এতই দ্রুত উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সুখানুভূতি এতই তীব্র হয় যে অতি অল্প সময়েই চরম তৃপ্তির কাছাকাছি

পর্যায়ে চলে যায় মানুষ। সঙ্গমের আগে নারী-পুরুষ যদি একই সাথে পরস্পর পরস্পরের যৌনাঙ্গ লেহন করে তাহলে শতগুণ বেড়ে যায় উভয়ের স্নায়বিক উত্তেজনার পরিমাণ। এইভাবে শৃঙ্গারের পর যোনি-লিঙ্গ সঙ্গমে যে চরম তৃপ্তি, তার তুলনা হয় না।

একে নোংরামি, বিকৃতি বা অস্বাভাবিক মনে করার কোন কারণ নেই। যৌন ক্রীড়ায় চরম আনন্দের শিখরে আরোহণ করাটাই আসল কথা, উদ্দেশ্যটা এখানে আনন্দ দেয়া এবং নেয়া। একমাত্র লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে নারী-পুরুষ উভয়ের শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। এর মধ্যে অশ্লীল, অশোভন বা অন্যায় তো কিছু নেই-ই বরং একে উচিত এবং তীব্রতম আনন্দ লাভের জন্যে একটা অপরিহার্য কাজ বলে জেনো। এটুকু ভরসা দেয়া যায়, সুস্থ নারী বা পুরুষের জননেন্দ্রিয়ে বাজে গন্ধ নেই, নোনতা স্বাদটাও খারাপ নয়, স্বাস্থ্যহানির কোন রকমের কোন আশঙ্কা নেই। এর ফলে অত্যন্ত শক্তভাবে লিঙ্গোদ্রেক হয় অনেক অক্ষম পুরুষেরও, দ্রুত ও তীব্র চরমানন্দ লাভ করতে পারে যে-কোন যৌনজড়তাক্রান্ত নারী।

বলতে পারো, তাই যদি হয় তাহলে যোনিপথে লিঙ্গ প্রবেশের দরকার কি, চুটিয়ে লেহন করলেই হয়। হয় না। তার কারণ লিঙ্গ-যোনি সঙ্গমের তৃপ্তি লেহন জনিত তৃপ্তির চেয়ে অনেক বেশি গভীর, অনেক বেশি আনন্দের। লেহনের

কাজ হচ্ছে সুখানুভূতিকে অত্যন্ত তীব্র করে একটা চরম শিখরে তুলে দিয়ে সঙ্গমের আনন্দকে বহু গুণে বাড়িয়ে দেয়া।

গোড়া থেকে ব্যাপারটা একবার দেখলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

যেইমাত্র নারী-পুরুষ সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, শুরু হয়ে গেল তাদের শারীরিক পরিবর্তন। কি ঘটতে চলেছে তার একটা মানসিক ছবি এসে যায় কল্পনায়। এই অবস্থায় পুরুষের ক্ষেত্রে লিঙ্গোদ্রেক ঘটে, লিঙ্গের উপরের চামড়া টান হয়ে যাওয়ায় অনুভব শক্তি বেড়ে যায় জিনিসটার। মেয়েদের বেলায় ভগাধার শুরু ফুলে ওঠে, ভগাঙ্কুর ও ভগাধার লঘু অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে।

কাপড় ছাড়া হলে পরস্পরের নগ্ন দেহের দিকে চেয়ে (দৃষ্টি) বৃদ্ধি পাচ্ছে উভয়ের উত্তেজনা। এবার শুরু হল চুম্বন (স্বাদ) আলিঙ্গন (স্পর্শ ও গন্ধ), ইত্যাদি। দুই একটা টুকরো কথা (শ্রবণ), হাসি, বাড়িয়ে তুলছে আনন্দের মাত্রা। দৃষ্টি, স্বাদ, স্পর্শ, গন্ধ, শ্রবণ—সব কাজ করছে মিলিতভাবে, বৃদ্ধি করছে উত্তেজনার মাত্রা। আর উত্তেজনা যতই বাড়ছে, মনোযোগ ক্রমে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে পরস্পরের যৌনাঙ্গের দিকে। ধীরে ধীরে আবছা হয়ে যাচ্ছে আর সব। পুরুষের হাত চলে যাচ্ছে নারীর ভগাঙ্কুর ও ভগাধার-লঘুতে, নাড়াচাড়া করছে সেগুলো। নারীর হাত চলে গেছে পুরুষের লিঙ্গের উপর।

উত্তেজনা বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। ক্রমে বাড়ছে আরও।

বেশির ভাগ নারী ভগাঙ্কুরের এই নাড়াচাড়াতেই সন্তুষ্ট হয়, কেউ কেউ চায় লিঙ্গের অনুকরণে যোনিপথে আঙ্গুল সঞ্চালন। যোনিপথে তর্জনী বা মধ্যমা ঢুকিয়ে সামনে পিছনে করলে এবং সেই সাথে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ভগাঙ্কুরে মৃদু আঘাত করলে সুখানুভূতির মাত্রা অনেক বেশি হতে পারে। একই ভাবে, পুরুষের লিঙ্গ, অণ্ডকোষ এবং তার পিছনের স্পর্শকাতর এলাকায় হাল্কাভাবে আদর করে তাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে নারী।

যাই হোক, এর পরের ধাপ হতে পারে পারস্পরিক অবলেহন। একই সাথে। এর ফলে দ্রুত চলে আসবে তারা একটা বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থায়। উত্তেজনা আর ধারণ করতে পারছে না স্নায়ুতন্ত্রীগুলো। এইবার নারী-পুরুষের সবচেয়ে স্পর্শকাতর দুটো অঙ্গ আসছে পরস্পরের সংস্পর্শে। আর সবকিছুই এখন গৌণ। এই দু'টি অঙ্গের ঘর্ষণে যে সুখানুভূতি হয় সেটা আর সবকিছুর চেয়ে অনেক বেশি, অনেক গভীর। স্নায়বিক সহ্যসীমা যখন পেরিয়ে যেতে চাইছে ঠিক তখনই ঘটছে এক অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণ। কেঁপে কেঁপে উঠছে উভয়ের শরীর, বাঁকা হয়ে যাচ্ছে পিঠ, নিজের আয়ত্তে থাকছে না নিজের কোমর। আশ্চর্য এক সংকোচন-প্রসারণ শুরু হয়ে যাচ্ছে নারীর যোনি প্রদেশে, চলমান লিঙ্গকে প্রাণপণে চেপে

ধরে ঘর্ষণ-জনিত সুখের প্রতিটি কণা উপভোগ করতে চায় যোনিপথ। চরম মুহূর্তে পুরুষের লিঙ্গের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে, যোনিপথের গভীরতম অঞ্চলে বীর্য-স্খলনের জন্যে উন্মত্তের মত শুরু হচ্ছে কোমর সঞ্চালন। আর সবকিছুর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায় এ সময়—আসে চরম আনন্দ।

উভয়ের চরমানন্দ যে ঠিক একই সঙ্গে হতে হবে তার কোন মানে নেই। হলে ভাল। না হলেও ভাল। একটু আগে পরে হলে নিজের আনন্দের সাথে সাথে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর আনন্দও উপভোগ করা যায়। পুরুষের আনন্দ যদি একটু আগে হয় তাহলে নারী তার লিঙ্গের অস্বাভাবিক কম্পন এবং বীর্যপাত আলাদাভাবে উপভোগ করতে পারে। বীর্য-স্খলনের সময় কোন কোন পুরুষ তার অণ্ডকোষে হাত বুলানো পছন্দ করে, কিংবা চায় সঙ্গিনী তার কোমর বা নিতম্ব ধরে সামনের দিকে টানুক। একটু আগে পরে হলে নারীর পক্ষে এই বাড়তি আনন্দটুকু দেয়া সম্ভব। তেমনি, নারীর আনন্দ যদি একটু আগে হয় তাহলে তার যৌনাঙ্গের অস্বাভাবিক সংকোচন-প্রসারণের ফলে লিঙ্গের উপর যে চাপ সৃষ্টি হয় সেটা উপভোগ করতে পারে পুরুষ। সেই সাথে সঙ্গিনীর আনন্দ বর্ধন করতে পারে লিঙ্গকে গভীরভাবে যোনিপথে প্রবিষ্ট করে রেখে। নিজ নিজ আনন্দে মত্ত থাকলে এই বাড়তি আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হয় দু'জনকেই। কাজেই সামান্য আগে পরে হলে সে

নিয়ে মন খারাপ না করে এটাকে আনন্দ-বর্ধনের কাজে লাগানো দরকার।

তবে যদি দু'জন একই সাথে আনন্দ লাভ করতে চায় তাহলেও উপায় আছে। নারীর দেরি দেখলে মৈথুন চলাকালে আঙ্গুল দিয়ে ভগাঙ্কুর নাড়াচাড়া করে তাকে বেশ একটু এগিয়ে নিতে পারে পুরুষ। এছাড়াও আগেভাগেই পুরুষের বীর্য-স্খলনের উপক্রম হলে লিঙ্গ চলাচলের গতি কিছুটা কমিয়ে দিলে অনেকখানি হ্রাস পাবে উত্তেজনা। কোন কোন নারীর যোনিপথের উপরের দেয়ালে কিছু স্নায়ুতন্ত্রী থাকে। এসব স্নায়ুতন্ত্রীর সাথে সরাসরি যোগ থাকে ভগাঙ্কুরের। ফলে চলাচলের সময় লিঙ্গের সাহায্যে উপর দিকে ঘর্ষণ করলে তাকে দ্রুত চরমানন্দের পথে এগিয়ে নেয়া যায়।

মাঝে মাঝে আসন পরিবর্তন করলেও আনন্দের পরিমাণ বাড়তে পারে। বাজারে চালু কিছু কিছু বইয়ের বিচিত্র সব উদ্ভট আসনের ছবি ও বর্ণনা দেখে হাসি সংবরণ করা যায় না। এসব আসনে সঙ্গম করতে হলে তোমাকে আগে অ্যাক্রোব্যাটিক চ্যাম্পিয়ান হতে হবে। অসুখ-বিসুখ বা অতিরিক্ত বড় ভুঁড়ি থাকলে আলাদা কথা, তবে স্বাভাবিক মানুষের জন্যে আমার কাছে সবচেয়ে উপযোগী মনে হয় সামনাসামনি সঙ্গম। কারণ, এতে পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখতে পায়, রতি-কালীন ভাব আদান-প্রদানে সুবিধা হয়।

নারী নিচে পুরুষ উপরে, এই ভঙ্গি কাউকে শেখাবার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু এর উল্টোটার কথা এখানে একটু বলা উচিত। এখানে পুরুষ চিত হয়ে শোবে, নারী উপরে উঠে উদ্রিক্ত লিঙ্গকে যোনিপথে ঢুকিয়ে নিয়ে কোমর সঞ্চালন করবে। এর ফলে লিঙ্গের চাপটা উপরের দিকে পড়ে এবং ভগাঙ্কুর ও ভগাধার-লঘু সরাসরি লিঙ্গের সংস্পর্শে আসতে পারে বলে নারীর সুখানুভূতি বৃদ্ধি পায়। লিঙ্গ-মণিতে বিশেষ ধরনের চাপ পড়ে বলে এইভাবে সঙ্গমকালে পুরুষও বৈচিত্র্যের স্বাদ পেয়ে থাকে।

যারা মনে করে এই আসনে পুরুষের অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়তা এবং নারীর সক্রিয়তার ফলে কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব চলে যাচ্ছে নারীর হাতে, অপমানিত হচ্ছে পৌরুষ, তাদের শুধু এইটুকুই বলা যায়, সঙ্গমের আনন্দ নারীপুরুষের যৌথ উদ্যমের ফল, কে কার উপরে উঠছে কিংবা কে ছাতের কতটা কাছে সেটা আসল কথা নয়। চরমানন্দই বড় কথা।

সঙ্গমের আনন্দ বাড়াবার জন্যে নারীর আরও কিছু ভূমিকা রয়েছে। যোনি প্রদেশের কয়েকটা পেশীর উপর আধিপত্য আনতে পারলে উভয়ের সঙ্গম-আনন্দের সাথে আরও কিছু যোগ করা সম্ভব। অল্পদিনের চেষ্টাতেই এই ক্ষমতা অর্জন করা যায়। প্রস্রাব সংবরণের ভঙ্গি করলে যোনি পথের সামনের দিকটা সংকুচিত হয়, এবং মল সংবরণের ভঙ্গি করলে

আগাগোড়া পুরো যোনিপথটাই সংকুচিত হয়। নিয়মিত কিছুদিন অভ্যাসের পর এই পেশী নিয়ন্ত্রণকে সঙ্গমকালে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা যায়। চেষ্টা করলে যোনির অভ্যন্তরে আশ্চর্য একরকম তরঙ্গ সৃষ্টি করে পুরুষের আনন্দকে অনেক বাড়িয়ে তোলা যায়।

তাহলে কি দাঁড়াল? আমরা জানি, একই সাথে প্রজনন, প্রেমের বহিঃপ্রকাশ আর দৈহিক আনন্দের জন্যে সঙ্গমের সৌভাগ্য মানুষের জীবনে খুব কমই আসে। বড় জোর বার দশেক। সঙ্গমের সাথে যদি মাঝে মাঝে একটু-আধটু প্রেম যুক্ত হয়, খুব ভাল কথা। কিন্তু নিছক দৈহিক তৃপ্তি বা আনন্দের জন্যে সঙ্গমকেও ছোট করে দেখবার প্রয়োজন নেই—যে যাই বলুক।

কে জানে, এ থেকেও প্রেমের জন্ম হতে পারে!

যৌন অক্ষমতা

পুরুষের
যৌন
অক্ষমতা

এ ব্যাপারে আগেই কিছুটা আভাস দেয়া হয়েছে, এবার আর একটু ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখা যাক। প্রথমে পুরুষের অক্ষমতাটা ভাল মত বুঝে নিয়ে আমরা নারীর সমস্যার প্রতি নজর দেব।

প্রথমে ধরা যাক সম্পূর্ণ অক্ষমতা বা absolute impotence-এর কথা। যে-কোন ধরনের যৌন অক্ষমতার প্রধান কারণ আত্মবিশ্বাসের অভাব। যৌন কর্মকাণ্ডের মূল কথাই হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। যে মনে করে 'আমি পারব' বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সত্যি সে পারে। এর উল্টোটা ভাবলেই শুরু হয়ে যায় গোলমাল। খুব নগণ্য কোন ব্যাপার থেকে প্রথমে শুরু হয়, ক্রমে নানান ধরনের জটিলতা যুক্ত হয়ে

কঠিন আকার ধারণ করে রোগটা। অশুভ চক্রের পাল্লায় পড়ে গেলেই ঘটে যায় বিপর্যয়।

শুরু হয় লিঙ্গ থেকেই। লিঙ্গোদ্রেক ক্ষণস্থায়ী। বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। মনটা অন্যদিকে গেলেই বসে পড়তে চায়। তাছাড়া একবার বীর্যপাত ঘটে গেলে পরবর্তী উদ্রেক নিজের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না (অন্তত প্রথম পনেরো বিশ মিনিট)। এসব কারণে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা আসতে পারে মনের মধ্যে। জিনিসটা যেমন খুব দ্রুত উঠে দাঁড়াতে পারে সামান্য কারণেই, তেমনি আকস্মিক কোন জোর আওয়াজে, সামান্য কোন কথায়, কিংবা সঙ্গিনীর টিটকারি বা তির্যক দৃষ্টির সামনে চুপসে যেতে পারে বেমালুম। বড়ই নাজুক এই আশ্চর্য যন্ত্রটি।

অসুস্থতা বা কাজের চাপে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ভারাক্রান্ত বা ক্লান্ত শরীর ও মন নিয়ে কেউ যদি সঙ্গমে লিপ্ত হতে গিয়ে দেখে যে তার লিঙ্গ কথা শুনছে না, যেমন ছিল তেমনি ঘুমিয়ে আছে চুপচাপ, তাহলে ঘাবড়াবার কিছুই নেই—বেশির ভাগ পুরুষ একে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করবে। তবু মনের গোপন কোণে সামান্য একটু সন্দেহের ছায়া যে পড়বে না এমন নয়। কিন্তু এই সময় যদি সঙ্গিনী তার পৌরুষ নিয়ে কোন কথা বলে বা টিটকারি দেয় কিংবা অন্য পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে তাকে অপমান করে, তাহলে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার

মনের মধ্যে। ঢুকে গেল সন্দেহের কালো ছায়া। পরের বার যখন সে আবার সঙ্গম করতে যাবে তখন ভয়ানক অনিশ্চয়তা আসবে তার মনে—আজও যদি সে রকম হয়! আজও যদি না দাঁড়ায়! এই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে এগুলো লিঙ্গোদ্রেকে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে যথেষ্ট। ধরা যাক, আজও বিফল হল সে। ব্যস, সন্দেহ ঘনীভূত হল আরও। পরপর দুই দিনের ব্যর্থতার ফলে তৃতীয় দিন সে ব্যর্থ হতে বাধ্য। পড়ে গেছে সে অশুভ চক্রের ফাঁদে। নতুন এক কণ্ডিশন্ড রিফ্লেক্স্ কাজ করতে শুরু করেছে তার মধ্যে, প্রয়োজনের সময় কিছুতেই আর দাঁড়াতে চাইবে না লিঙ্গ। বেশির ভাগ যৌন-অক্ষমতার শুরু এ ধরনেরই হয়। সম্পূর্ণ অক্ষম ব্যক্তিদের শতকরা পঁচানব্বই ভাগের বেলায় অসুবিধাটা শুধু নারীর সংস্পর্শে এলেই, অন্য সময় দিব্যি উঠে দাঁড়ায় লিঙ্গটা মালিকের ইশারা পেলেই।

আসলে গোলমাল তার লিঙ্গে নয়, তার মনের মধ্যে। ভয় এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবই আসলে যৌন অক্ষমতার মূল কারণ।

সম্পূর্ণ অক্ষমতার আর একটা প্রকারভেদকে বলে Copulatory impotence বা সঙ্গমে অক্ষমতা। যৌন উত্তেজনা হচ্ছে, লিঙ্গোদ্রেকও হচ্ছে, কিন্তু যোনি পথে প্রবেশ করলেই নেতিয়ে পড়ছে সেটা তেনার মত। এর অন্তর্নিহিত

কারণ খুঁজতে গেলে হয়ত দেখা যাবে স্ত্রীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করছে সে এইভাবে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আসব আমরা আর একটু পর। তার আগে premature ejaculation বা অকাল বীর্যপাত সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

এটাকেও যৌন অক্ষমতা বলছি এই জন্যে যে যৌথ একটা উদ্যমে পুরোপুরি অতৃপ্ত রয়ে যাচ্ছে সঙ্গিনী সঙ্গীর অকাল বীর্যপাতের ফলে—সঙ্গম সম্পূর্ণ হচ্ছে না। অনেকে পশু-পক্ষীর দ্রুত বীর্যপাতের দোহাই দিয়ে এটাকে স্বাভাবিক বলে চালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এই যুক্তি ধোপে টেকে না। পশু-পক্ষীর আচরণই যদি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক হয়, তাহলে মানুষ তাদের অন্যান্য আচরণও অনুসরণ করে না কেন? আসলে এটা নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার ফিকির ছাড়া আর কিছু নয়। ইতর প্রাণীর মত আমরা যখন ঘেউ ঘেউ করি না, কিংবা ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করি না, তখন তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে লাভ নেই।

Psychogenic asperima বা স্খলনহীন সঙ্গম হচ্ছে আর এক রকম যৌন অক্ষমতা। এটা খুবই বিরল। এ ক্ষেত্রে লিঙ্গোদ্রেক হচ্ছে, যৌনাঙ্গের অনুভূতি রয়েছে পুরোপুরি, কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা চেষ্টার পরও বীর্যপাত ঘটাতে পারছে না পুরুষ। অকাল বীর্যপাতকারীর কাছে অনেক সময় মনে হতে পারে এই রোগ হলেও বরং ভাল ছিল। কিন্তু রোগ রোগই।

রোগ কারও কাম্য হওয়া উচিত নয়। তবে এ রোগের এক মস্ত সুবিধা এই যে উপযুক্ত মানসিক চিকিৎসকের হাতে পড়লে খুব দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় এসব রোগী, অন্যান্য অক্ষমতার বেলায় সময় লাগে অপেক্ষাকৃত বেশি।

কোন্‌টা স্বাভাবিক বলব

যৌন অক্ষমতার চিকিৎসার ব্যাপারে মন্তব্য করবার আগে আমাদের পরিষ্কার ধারণা করে নিতে হবে স্বাভাবিক যৌনক্রিয়া কাকে বলে। ব্যাপারটা যদিও এক্কেক জনের বেলায় একেক রকম হয়, তবু মোটামুটি ভাবে ধরে নেয়া যায়, প্রথম প্রয়োজন দরকারের সময় লিঙ্গোদ্রেক হওয়া, দ্বিতীয় যোনিপথে লিঙ্গের প্রবেশ, তৃতীয় এই অবস্থায় লিঙ্গের কাঠিন্য না হারানো, এবং চতুর্থ সঙ্গিনীকে তৃপ্তি দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট সময় বীর্যপাত না ঘটিয়ে কাজ চালু রাখা। এই কয়টি প্রয়োজন পূরণ করতে পারলে যে-কোন পুরুষকে স্বাভাবিক বলা যায়। কিন্তু শেষোক্ত প্রয়োজনের প্রশ্নে নানা রকম তারতম্য দেখা যায়। সঠিক কোন সময় নির্দেশ করা যায় না। কারণ যোনিপথে লিঙ্গ প্রবেশের আগে যদি সঙ্গিনীকে বিভিন্ন

প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে উত্তেজিত করে নেয়া যায় তাহলে খুব অল্প সময়ে চরমানন্দ দেয়া সম্ভব, কিন্তু ভগাঙ্কুর ও ভগাধার-লঘুকে যদি যথেষ্ট পরিমাণ খাতির যত্ন না করেই সঙ্গম শুরু করা যায় তাহলে তার চরমানন্দ লাভে প্রচুর বিলম্ব হতে পারে। তাই সময়টা সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি ভাবে পঞ্চাশ থেকে একশো বার আগু পিছু করা বা অন্য ভাষায় পাঁচ থেকে দশ মিনিট লিঙ্গ চালনা করতে পারাকে স্বাভাবিক বলা যায়।

কারও কারও ধারণা, দিনে দুইবার বা তিনবার বা আরও বেশি যে যত বার সঙ্গম করতে পারে সে তত বড় বীর। আবার কেউ কেউ খনার বচন আউড়ায়ঃ মাসে এক বছরে বারো, তার কম যে যত পারো। আধুনিক বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, কারও জন্যে দিনে বা সপ্তাহে কতবার সঙ্গম করা স্বাভাবিক সেটা নির্ভর করে তার স্বাস্থ্য, পেশা, ব্যক্তিগত রুচি, সঙ্গিনীর অতি আকর্ষণ, বয়স ইত্যাদি নানান ব্যাপারের উপর। কাজেই যার যার স্বাভাবিক নিয়ম তার নিজেকেই আবিষ্কার করে নিতে হবে। তবে এটুকু বলা যায়, সপ্তাহে দুই থেকে বারো বার পর্যন্ত সঙ্গম স্বাভাবিক। কোন কোন সপ্তাহে এর কম বা বেশিকে যদিও অস্বাভাবিক বলা ঠিক হবে না, তবে মোটামুটি ভাবে আমরা এটাকেই স্বাভাবিকতার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

আর একটা ব্যাপার হচ্ছে একবার বীর্যপাত ঘটে যাবার পর আবার লিঙ্গোদ্রেক হতে কতক্ষণ সময় লাগা উচিত এ নিয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায়। কার কত তাড়াতাড়ি দাঁড়ায় সে নিয়ে নানান রকম গাল-গল্প মেরে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করতে চায় পুরুষ একে অপরের কাছে। কেউ বলে এক ঘন্টায় সে চার বার সঙ্গম করতে পারে, অপর জন বলে সে পারে সাত বার। ভাগ্য ভাল, কেউ বিশবার বলে না, কারণ তাহলে আবার সে অকাল বীর্যপাতের দলে পড়ে যাবে।

আসলে একবার বীর্যপাতের পর আবার লিঙ্গোদ্রেক ব্যাপারটাও এক একজনের বেলায় এক এক রকম। দুই মাস পূর্ণ বিরতির পর একজন চল্লিশ বছরের কম বয়স্ক পুরুষের প্রথম স্খলনের পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার লিঙ্গোদ্রেক হতে পারে। আবার যে লোক প্রতি রাতেই নিয়মিত সঙ্গম চর্চা করছে, তার বেলায় দ্বিতীয় উদ্রেক আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা সময় নিতে পারে। কার কত আগে লিঙ্গোদ্রেক হয় সেটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, কারণ সবাই জানে, প্রথমটাই আসল, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারে প্রথম বারের মত আনন্দ হয় না। আর প্রথম বারেই যদি সঙ্গিনীকে তৃপ্তি দেয়া যায় তাহলে আর দ্বিতীয়, তৃতীয় বারের বড় একটা প্রয়োজন পড়ে না।

এবার আবার অক্ষমতার প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক।

হিসেব করে দেখা গেছে অকাল বীর্যপাতকে ধরে স্থায়ী যৌন অক্ষমতার হার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। হ্যাঁ, রীতিমত চমকে ওঠার মতই। পৃথিবীর প্রাপ্তবয়স্ক অর্ধেক লোকই ভুগছে কোন না কোন ধরনের যৌন অক্ষমতায়।

প্রতিকার কি

স্খলনহীন সঙ্গমের কথা আগেই বলা হয়েছে, যোগ্য মনস্তত্ত্ববিদের চিকিৎসায় খুব দ্রুত ভাল হয়ে যেতে পারে এ রোগ, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে পণ্ডশ্রম করা থেকে রেহাই পেতে পারে পুরুষ ও নারী উভয়েই।

অকাল বীর্য-পাতের চিকিৎসা অত সহজ নয়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এ নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে, নানান ভাবে সমাধান বের করার চেষ্টা করেছে এই সমস্যার। নানা মুনির নানান মত। কেউ বলছে পর পর দুইবার সঙ্গম করো, দ্বিতীয়বার লিঙ্গের স্পর্শকাতরতা কমে গিয়ে বেশিক্ষণ বীর্য ধারণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার কাজটা আসলে তেমন আনন্দজনক হয় না, পরবর্তী লিঙ্গোদ্রেকের জন্যে অনিশ্চিত অপেক্ষা নির্যাতনের শামিল, আবার সঙ্গম করতে হবে ভাবলে সেই মুহূর্তে সেটা ক্লান্তিকর শারীরিক পরিশ্রম

ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না, তার উপর অনেক সময় দেখা যায়, এইবারও সঙ্গিনী তৃপ্ত হওয়ার অনেক আগেই বীর্য-স্খলন হয়ে বসে আছে। ব্যাপারটা অভুক্তকে আদর করে ডেকে খেতে বসিয়ে খাওয়া শুরু করবার মুহূর্তে একটানে থালা সরিয়ে নেয়ার মতই অন্যায় নির্যাতন। পুরুষের পক্ষেও এটা মোটেই সুখকর নয়, কতদিন আর মাথা নিচু করে লজ্জিত কৈফিয়ত দেয়া যায়?

অনেকে সঙ্গমের ঘন্টাখানেক আগে হস্তমৈথুন করে নিজের অনুভূতিগুলোকে একটু থিতিয়ে নিতে চায়। কিন্তু এটা কোন সমাধান হল না। স্বমেহনই যদি করতে হয় তাহলে আর নারীর প্রয়োজন কি?

কেউ কেউ সঙ্গমের সময় অন্য চিন্তা করবার উপদেশ দেয়। কঠিন কোন অঙ্ক কষার, কিংবা একশো, নিরানব্বই, আটানব্বই করে গুনতে গুনতে নিচের দিকে নেমে আসার, কিংবা বীভৎস, কুৎসিত বা দুঃখজনক কোন ঘটনার কথা ভাববার পরামর্শ দেয়। কিন্তু এসব সমস্যাটাকে ভুল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখারই ফল। লাভ হয় না কোন। পোলাও-কোর্মা খেতে বসে ডাস্টবিনের নোংরা আবর্জনার কথা ভাবলে খাওয়ার তৃপ্তি হতে পারে না। কেউ কেউ আবার বুদ্ধি দেয়, শায়েস্তা করো নিজেকে—হস্তমৈথুন শুরু করো, কিন্তু বীর্যস্খলনের ঠিক আগের মুহূর্তে থেমে যাও, খানিক বিশ্রাম

দিয়ে আবার লাগো ওটার পেছনে, কিন্তু যেই বীর্যপাতের উপক্রম হবে, থেমে যাও আবার। এইভাবে নিজেকে শায়েস্তা করলে সেরে যাবে রোগ। দুঃখের বিষয় এই চিকিৎসার ফলে রোগটা বাড়তে বৈ কমতে দেখা যায়নি আজ পর্যন্ত।

লিঙ্গের সুখানুভূতি কমাবার পরামর্শ দেয় অনেকে। একসাথে তিন-চারটে কনডোম পরে নিলে কিছু বেশি সময় বীর্য ধারণ করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সঙ্গমের আনন্দ অস্বাভাবিক রকমে হ্রাস পায় এর ফলে, ক্ষুণ্ন হয় সঙ্গমের উদ্দেশ্যটাই। Dibucaine মলম লাগিয়ে লিঙ্গের স্নায়ুতন্ত্রীগুলোকে অবশ করে নিয়ে অকাল বীর্যপাত ঠেকাবার চেষ্টা করেছে কেউ কেউ। এর ফলে তিনটে অবাঞ্ছিত উপসর্গ দেখা দিতে পারে। লিঙ্গে কোন রকম সাড়া না থাকায় অন্তত প্রথম রাতের জন্যে সাইকোজেনিক অ্যাসপেরিমা আসতে পারে পুরুষের। এটা ব্যবহার করে কারও কারও আবার সারা লিঙ্গে ফোসকা উঠে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটতে দেখা গেছে। যেসব নারীর এই ওষুধে অ্যালার্জী আছে তাদের যোনি পথেও ঠিক এই একই ব্যাপার ঘটতে পারে। কিন্তু আসল বিপদ হচ্ছে এই অ্যানাসথেটিক মলম কয়েক মাস ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে এটা সহ্য হয়ে যায় এবং অতি সামান্য কারণেই বীর্যপাত ঘটে। সঙ্গিনীর হাতের সামান্য ছোঁয়াতেই 'চিড়িক, চিড়িক—খতম' হয়ে যেতে পারে।

কাজেই হাতুড়ে চিকিৎসায় এর কোন সমাধান নেই।

সম্পূর্ণ অক্ষম বা সঙ্গমে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্যেও নানান রকমের হাতুড়ে চিকিৎসা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। যৌন উত্তেজনাবর্ধক নানা ধরনের খাওয়ার ওষুধ তো আছেই, বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কার হয়েছে এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু এসবের কোনটাকেই স্বাভাবিক সঙ্গমের সাথে তুলনা করা যায় না। বৈদ্যুতিক লিঙ্গোদ্রেক-যন্ত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। এরকম আরও একটা মোটামুটি চলনসই কম খরচের যন্ত্র হচ্ছে ছোট্ট একটা শক্ত রবারের রিং। মোটেই যাদের লিঙ্গোদ্রেক হয় না তাদের বেলায় এটা বিশেষ কাজে আসে না, কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় লিঙ্গোদ্রেক হলে সেটাকে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে ধরে রাখার ব্যবস্থা হতে পারে এটা দিয়ে। কিছু না, উদ্রিক্ত লিঙ্গকে জোর করে ঢুকিয়ে দিতে হয় রিং-এর মধ্যে দিয়ে যাতে লিঙ্গের গোড়ায় এসে চেপে বসে রিংটা। এর ফলে লিঙ্গোদ্রেকের সময় যে রক্ত এসে পকেটগুলোয় জমেছে সেটা আর বেরিয়ে যেতে পারছে না। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত রিংটা বের না করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে সেটা। কিন্তু সেই একই কথা আবার বলতে হয়, স্বাভাবিক সঙ্গম এক জিনিস আর যন্ত্রপাতির সাহায্যে সঙ্গম অন্য জিনিস। লাভ এক জিনিস, ক্ষতিপূরণ আর এক জিনিস।

যৌন-অক্ষমতাকে বুঝতে হলে প্রথমে বোঝা দরকার রোগটা আসলে লিঙ্গে নয়, মস্তিষ্কে। সম্পূর্ণ অক্ষমের শতকরা মাত্র পাঁচজন ভাগ্যহতের ক্ষেত্রে এই রোগ শারীরিক, বাদ বাকি সবাই ভুগছে মানসিক রোগে। উপরটা ভাল হয়ে গেলেই নিচটা ভাল হয়ে যায় আপনা-আপনি। মনের কোন এক বা একাধিক চাপ থেকে এর উৎপত্তি। গিঁঠ লেগে গেছে মনের কোথাও। কারও কারও বেলায় দেখা যায় সঙ্গিনী ধর্ষিতা হচ্ছে এরকম অভিনয় না করলে এবং বাধা দেয়ার চেষ্টা না করলে তাদের লিঙ্গোদ্রেক হয় না। কেউ কেউ আবার নিজের স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে অক্ষম, কিন্তু অন্য নারীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেলে রীতিমত সক্ষম। এটা টের পেলে স্বভাবতঃই পুরুষ ধরে নেয় দোষ তার মধ্যে নেই, পুরো দোষটা স্ত্রীর। ভাঙল ঘর। দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করে এরা মনে করে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু অল্পদিনেই দেখা যায় নতুন জনের সাথে সঙ্গমেও নন-কোঅপারেশন শুরু করেছে লিঙ্গ, রীতিমত গোলমাল শুরু করে দিয়েছে কাজের সময়।

যেখানে ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট বা কোন রকম দায় দায়িত্ব নেই, এরকম অপর কোন নারীর সংস্পর্শে এলে আবার এরা সক্ষম প্রমাণ করতে পারবে নিজেদের। কিন্তু সমাধান হবে না সমস্যার।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় চাপা একটা আক্রোশ

আর প্রতিশোধের মনোভাব রয়েছে সঙ্গমে অক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে। এই আক্রোশ সব নারী বা বিশেষ কোন নারীর প্রতি হতে পারে। সচেতন বা অবচেতন ভাবে নিজের লিঙ্গকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তখন পুরুষ। কিছুতেই তৃপ্তি দেয় না সঙ্গিনীকে। এতে তার নিজের যা ক্ষতি হয় হোক।

অকাল বীর্যপাতের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপরের কথাটা সত্য। তবে আমার মনে হয় এই সাথে আরও একটা কারণ যুক্ত রয়েছে। নারী-সঙ্গমের উপযুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত শতকরা একশো ভাগ পুরুষই স্বমেহন করে থাকে। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু করে বেশ কয়েক বছরের নিয়মিত বা অনিয়মিত অভ্যাসে হাত পাকিয়ে ফেলে এ কাজে। হস্তমৈথুনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বীর্যপাত ঘটানো। দ্রুততাই লক্ষ্য এখানে। ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি মেটে ততই ভাল। আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহের ফলে দ্রুত বীর্যপাতের জন্যে কণ্ডিশনড্ হয়ে যায় নার্ভাস সিসটেম। বিয়ের পর প্রথম প্রথম প্রত্যেক পুরুষকেই দ্রুত বীর্যপাতের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায়। চেষ্টা করেও দেরি করা যায় না তখন, কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্সের ফলে প্রবেশের প্রায় সাথে সাথেই খেল খতম, পয়সা হজম। অনেকের বেলায় আপনা-আপনি সেরে যায় এটা, অনেকের সারে না।

যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে, কণ্ডিশনিং হোক বা সঙ্গিনীর

উপর শোধ তোলার জন্যে হোক, বা অন্য কোন কারণেই হোক, রোগটা মানসিক। এক্ষেত্রে শারীরিক চিকিৎসা করে ওষুধ খেয়ে বা যন্ত্র লাগিয়ে লাভ নেই। আধুনিক মনোবিজ্ঞান খুব সহজেই প্রমাণ করেছে যে এটা সত্যিই একটা মানসিক ব্যাধি, শারীরিক নয়। গবেষকরা দেখিয়েছেন, কোন রকম ওষুধ ছাড়াই শুধু মানসিক গিঁঠটা কোথায় এবং সত্যিকারের কারণটা কি রোগীকে বুঝিয়ে দিয়ে তাকে রোগমুক্ত করা সম্ভব। সম্মোহনের সাহায্যে আশ্চর্য সব কাণ্ড ঘটানো সম্ভব হয়েছে। সম্পূর্ণ অক্ষম বা সঙ্গমে অক্ষম ব্যক্তিকে পোস্ট-হিপনোটিক সাজেশন দিয়ে তৃপ্তিকর সঙ্গমে লিপ্ত করা গেছে, অকাল বীর্যপাত ঠেকিয়ে দেয়া গেছে যতক্ষণ খুশি। এইভাবে আপাতত সারিয়ে তুলে রোগীর আত্মবিশ্বাস এনে ধীরে সুস্থে মূল কারণ খুঁজে বের করে সম্পূর্ণ নিরাময় করা হচ্ছে আজকাল যৌন-অক্ষম ব্যক্তিদের। যৌন-অক্ষমতা আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয়।

আমাদের দেশেও মনো-বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে। ইচ্ছে করলেই যে-কেউ সাইকোথেরাপি বা হিপনোথেরাপি গ্রহণ করতে পারে।

নারীর যৌন জড়তা

এবারে আসা যাক নারীর প্রসঙ্গে। পুরুষের মত নারীও কি যৌন-অক্ষমতায় ভোগে?

হ্যাঁ, ভোগে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাধিটা মানসিক। প্রধান দুটো কারণ হচ্ছে ভয়, আর পাপ-বোধ। এদেশের পুরুষ শাসিত পর্দানশিন নারীদের মনে কচি বয়স থেকে সঙ্গম সম্পর্কে এমন ভয় ও পাপ-বোধ ঢুকিয়ে দেয়া হয় যে বিয়ের পরও সেটা কাটিয়ে ওঠা তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। যৌন-ক্রীড়ায় যে দোষ নেই, এটা যে মানব-মানবীর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক তাড়না, সেটা বুঝে উঠতে অনেক দেরি করে ফেলে অনেকে, অনেকে কোনদিন বুঝতে পারে না। চিরকালই তাদের ধারণা থেকে যায়, এটা জঘন্য একটা কাজ, স্বামীর পীড়াপীড়িতে লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছে বটে কিন্তু এটা যে একটা মহা পাপের কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সঙ্গমে চরমানন্দ লাভের প্রধান শর্তই হচ্ছে পারস্পরিক সমঝোতা। প্রথম প্রথম সমঝোতা আসতে চায় না, বেশ কিছুদিন সময় চলে যায় পরস্পরের ধারা বুঝে নিতেই। তাতে ঘাবড়াবার কিছুই নেই, বিবাহিত জীবনে অন্তত সাত হাজার বার সুযোগ আসবে সমঝোতা গড়ে নেয়ার। কিন্তু ছয় মাস চেষ্টার পরেও যদি দেখা যায় যে চরমানন্দ ঘটছে না, তখন মনোযোগ দেয়া দরকার মনের দিকে।

ব্যথার ভয়, পেটে বাচ্চা আসার ভয়, পাপ-বোধ, জন্মের পর থেকেই এসব ব্যাপারে বাপ-মার ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা, ইত্যাদি নানা কারণে কারও মনে সঙ্গমের ব্যাপারে প্রচণ্ড ভীতি দেখা দিতে পারে। এর ফলে কারও কারও মধ্যে ভেজিনিসমাস রোগের জন্ম হয়। যোনিপথ আশ্চর্য রকম সংকুচিত হয়ে যায় এদের সঙ্গম কালে। জোর করে লিঙ্গ প্রবেশ করালে অত্যন্ত ব্যথা পায় সে মেয়ে, এমন কি হঠাৎ আচমকা প্রচণ্ড জোরে লিঙ্গকে আঁকড়ে ধরে অনেক সময় যোনিপথ। তখন সেটা বের করে আনা এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। একবার ফাঁদে পড়লে এ মেয়ের কাছে ভিড়তে চায় না পুরুষ। এটা শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে মানসিক রোগ। মুখে যাই বলুক মনের ভিতর সঙ্গমের বিরুদ্ধে প্রবল এক বিদ্রোহ রয়েছে এসব রোগীর, রয়েছে প্রতিশোধ স্পৃহা। যোনিমুখ দিয়ে এরা চিৎকার করে জানাচ্ছে—তোমাকে চাই না আমি, পছন্দ করি না,

তোমার সাথে সঙ্গম করতে ঘৃণা বোধ করি। এই আক্রোশের সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারলে এই রোগ দূর করা সহজ কাজ। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে স্বামী যদি স্ত্রীর উপর দিনের পর দিন বলাৎকার করে চলে তাহলে সে অন্যভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে। কোন রকম যৌনানুভূতি ছাড়াই সঙ্গম করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তার শরীর। মন পড়ে থাকে একখানে, নিঃসাড় শরীরটা আর একখানে। নীরবে ভর্ৎসনা জানাচ্ছে সে—ঠিক আছে, এতেই যদি তোমার আনন্দ, করো, যেমন খুশি ব্যবহার করো আমার শরীরটাকে, কিন্তু তাই বলে ভেবো না আমার মন পাবে। আক্রোশের ফলে নিজের কতটা ক্ষতি হচ্ছে বুঝতে চাইবে না এরা কিছুতেই।

শারীরিক কারণে যৌন-অক্ষম স্ত্রীলোকের সংখ্যা এতই অল্প সেটা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এটা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের মত ব্যাপার। মনের মধ্যে যে আবেগজনিত গোলমাল রয়েছে সেটার স্বরূপ বুঝতে পারলে এবং সেরে উঠে স্বাভাবিক জীবন যাপনের ইচ্ছে থাকলে যে-কোন যৌন জড়তাগ্রস্ত নারী খুব অল্পদিনেই সেরে উঠতে পারে। ফিরে পেতে পারে সঙ্গমের আনন্দ। এর জন্য অল্প বিস্তর হস্ত মৈথুনের (সম্ভব হলে ভাইব্রেটারের সাহায্যে) প্রয়োজন পড়তে পারে চিকিৎসা হিসেবে।

সঙ্গমে অনভিজ্ঞা নারী যাদের চরমানন্দ সম্পর্কে পরিষ্কার

ধারণা না থাকায় এর মধ্যে কোন রকম মজা খুঁজে পায় না, তাদের বেলায় হস্ত মৈথুনের চিকিৎসা খুবই কার্যকরী। একবার ধারাটা পেয়ে গেলে, কিভাবে কি হয় একবার ঠিকমত বুঝে গেলে সহানুভূতিশীল পুরুষ সঙ্গী পেলে নারীর যৌন জড়তা দূর হতে বেশি সময় লাগে না।

চরমানন্দ লাভে সক্ষম, এবং নিয়মিত সঙ্গমে তৃপ্তি পেয়ে আসছে এমন নারীও মাঝে মাঝে যৌন-জড়তায় ভুগতে পারে সাময়িক ভাবে। সাধারণত এটা অল্পদিনেই আপনা-আপনি দূর হয়ে যায়। জটিল যন্ত্রপাতি মাঝে মধ্যে একটু-আধটু গোলমাল করেই থাকে।

সর্বশেষ কথা হচ্ছে চর্চা। নিয়মিত সঙ্গম চর্চা করে গেলে শারীরিক ও মানসিক কোন দিক থেকেই গোলমালের আশঙ্কা থাকে না। প্রকৃতিদত্ত এই অফুরন্ত-ভাণ্ডারে তালাচাবি মেরে রাখলে নারী-পুরুষ কারও কোন লাভ নেই। দরকার হলে ক্ষতিকর লজ্জা ত্যাগ করতে হবে মেয়েদের, সঙ্গীকে জানাতে হবে সঙ্গমেচ্ছা।

আক্রোশ শাঁখের করাতের মত। নারীকেও কাটে, পুরুষকেও।

স্বমেহন

স্বমেহনে
পাপবোধ

ইংরেজি Masturbation শব্দটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ Masturbari থেকে—এর মানে নিজেকে কলুষিত করা। বাংলা ভাষাতেও আমরা স্বমেহন বা হস্তমৈথুনের সাথে এই কলুষ বা পাপবোধ যুক্ত করে নিয়েছি।

ছোট কাল থেকে আমরা শুনে আসছি হস্তমৈথুন শরীরের জন্যে ভয়ানক ক্ষতিকর, পাপ। এটা চর্চা করলে শরীর ভেঙে পড়ে, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, পুরুষত্বহানি ঘটে, আত্মা কলুষিত হয়, মুখে ব্রণ ওঠে, দাম্পত্য জীবন অসুখী হয়, স্ত্রীকে সঙ্গমে সুখ দেয়া যায় না। শুনেছিলাম, সত্তর ফোঁটা রক্ত দিয়ে নাকি তৈরি হয় এক ফোঁটা বীর্য, কাজেই বীর্যপাত ঘটলে সেই সাথেই বেরিয়ে যাচ্ছে পুরুষের জীবনীশক্তি। আরও কত কি! বড় হয়ে যখন জানতে পারলাম সব ভুয়ো কথা তখন ভয়ানক রাগ হয়েছিল। এইসব

আজগুবি কথা বিষময় করে দিয়েছিল আমার জীবনের দশ-বারোটা বছর। নানান রকম ভয়, ভীতি আর আশঙ্কায় কাটাতে হয়েছে আমাকে এতগুলো মূল্যবান বছর।

তোমার মনেও নিশ্চয়ই এসব ভুল ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। তোমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে এই কাজের সাথে জড়িত সবক'টা ভুল ধারণাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা।

স্বমেহনের একমাত্র ক্ষতি হচ্ছে এই কলুষ-বোধ। আর কোন ক্ষতি আছে বলে পৃথিবীর কেউ কোন প্রমাণ দেখাতে পারেনি। অতিরিক্ত সব কিছুই খারাপ। খাওয়া, লেখাপড়া, ঘুম, খেলা সবকিছুই অতিরিক্ত হয়ে গেলে খারাপ। তাই বলে এগুলোকে খারাপ কাজ বলা যায় না।

তোমার জানা উচিত, হস্তমৈথুনের ফলে শারীরিক বা মানসিক কোন দিক থেকেই কোন রকম ক্ষতির আশঙ্কা নেই। যদি তাই হত তাহলে পৃথিবীর সব মানুষের সর্বনাশ হয়ে যেত। কারণ পৃথিবীতে এমন একটি ব্যক্তি নেই যে বুকে হাত রেখে বলতে পারবে জীবনের কোন না কোন সময়ে স্বমেহনে প্রবৃত্ত হয়নি।

কেন মানুষ এই কাজটা করে তার উত্তর খুবই সহজ—ভাল লাগে বলে। নারী-পুরুষের সঙ্গমের মত অতোটা ভাল লাগে না ঠিক, কিন্তু তার কাছাকাছি যায়। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর অভাবে এটা একটা চমৎকার আনন্দদায়ক বিকল্প। খুব অল্প

বয়সেই এটার শুরু, বড় হয়ে অভ্যাসটা নারী-পুরুষের সঙ্গমে রূপান্তরিত হয়, বুড়ো হয়ে সঙ্গমের সুযোগ হারালে আবার ফিরে আসে পুরানো অভ্যাস। তাই কৈশোর ও বার্ধক্যকে হস্তমৈথুনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। উভয় ক্ষেত্রে যৌনক্ষুধা বর্তমান, কিন্তু প্রায়ই সঙ্গী বা সঙ্গিনীর অভাব দেখা যায়।

ছয় মাস বয়সের শিশুকেও হস্তমৈথুন করতে দেখা গেছে। তবে সাধারণত দুই-তিন বছর হলে ঘাঁটাঘাঁটিটা একটু প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

ছেলেরা উদ্রিক্ত লিঙ্গ হাত দিয়ে চেপে ধরে হাতটা সামনে পিছনে করে মজা পায়। আর মেয়েদের দৃষ্টি যায় ভগাঙ্কুরের দিকে। এই বয়সে বেশির ভাগ মেয়েই যোনিপথের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে না। ভগাঙ্কুরটা হালকা ভাবে নাড়াচাড়া বা ঘষাঘষি করে আনন্দ পায়।

বাচ্চাদের মধ্যে এই কাজটা এত বেশি জনপ্রিয় হওয়ার আর একটি কারণ হচ্ছে বাপ-মার বারণ। এই সেদিন পাশের ঘর থেকে শুনলাম তোমার মা বকছে তোমাকে—হাত সরা। হাত সরা ওখান থেকে, পাজি কোথাকার!

বুঝলাম কোথা থেকে সরাতে বলা হচ্ছে তোমাকে হাত। কাজটা আড়ালে আবডালে করে বেড়ালে ক্ষতি নেই, কিন্তু লোকের সামনে যাতে লজ্জায় না ফেলে দাও সেজন্যে তোমাকে এই শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তুমি দেখছ

শরীরের আর কোথাও হাত দিলে কিছু বলে না, শুধু এই জায়গায় হাত গেলেই খ্যাঁক করে উঠছে তোমার মা—কাজেই বাধা পেয়ে তোমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল জায়গাটার প্রতি। যা কিছু নিষিদ্ধ তার প্রতি মানুষের দুর্বার আকর্ষণ। তাছাড়া তোমার ভাল করে জানা আছে, তোমার আম্মা তোমাকে যা কিছু করতে বলে, যেমন, দাঁত মাজা, গোসল করা, দুধ খাওয়া—সবগুলোই বিচ্ছিরি কাজ; আর যেটাই বারণ করে যেমন, আইসক্রিম, টফি, ললিপপ খাওয়া—সেগুলো দারুণ ভাল লাগে। কাজেই আম্মা যেটা বারণ করছে নিশ্চয়ই তার মধ্যে দারুণ কিছু মজা আছে। ব্যস, ফুলস্পীডে চলল তোমার গোপন প্র্যাকটিস।

মেয়েদের বেলায়ও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। আসল কাজটায় দোষ নেই, ক্ষতিও নেই, কিন্তু এই যে অন্যায়-বোধ, একটা চোর চোর ভাব, ক্ষতি সেখানেই।

বয়ঃসন্ধির আগে পর্যন্ত স্বমেহনটা সুড়সুড়ি জাতীয় মজার অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু বারো-তেরো বছরের দিকে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে মানুষের দেহের ভিতর-বাইরে। যৌন অঙ্গের আকার বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে, শরীরের নানান জায়গায় রোম গজিয়ে উঠেছে, রক্তের মধ্যে এসে মিশতে শুরু করেছে হরমোন। ফলে থেকে থেকে অস্বাভাবিক উত্তেজনা আসছে, কিছুতেই চেপে রাখা যাচ্ছে না

চিত্ত-চাঞ্চল্য। এই প্রথম চরম-পুলক এসে যোগ দিতে যাচ্ছে সুড়সুড়ি জাতীয় সুখানুভূতির সাথে।

ছেলেদের বেলায় প্রথম দিকে শুকনো-পুলক হয় কিছুদিন—বীর্যপাতহীন চরমানন্দ। তারপর সামান্য একটু বীর্য দেখা দেয়, এবং ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এর পরিমাণ। মেয়েরাও এই সময় প্রথম বারের মত সত্যিকারের যৌন অনুভূতি বুঝতে শেখে। অল্পতেই ভগাঙ্কুরের শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ানো, বাড়ন্ত ভগাদারলঘুর উপস্থিতি ঘোষণা, এবং ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার ফলে যৌনাঙ্গের প্রতি তাকে মনোযোগী হতেই হয়। কিন্তু ছেলেদের মত অতটা সরাসরি হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয় না মেয়েরা এই বয়সে। সাধারণত ষোলো-সতেরোর আগে সেটা আসে না। কিন্তু আগে তেরো-চোদ্দর কথাটা শেষ করে নেয়া যাক।

এই বয়সে তোমার মধ্যে যৌন উত্তেজনার যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হবে সেটাকে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করার চেষ্টা করা বোকামি। বহিঃপ্রকাশ চাই। খেলাধুলো, পড়াশোনা, গান-বাজনা, কোন কিছু দিয়ে ভুলাতে পারবে না তুমি নিজেকে। যখন তখন মাথা চাড়া দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইবে তোমার গোপন অঙ্গ। ব্রহ্মচর্যের বুলি শুনিয়ে ওটাকে ঠাণ্ডা রাখা যাবে না। হস্তমৈথুন ছাড়া পথ নেই। বিয়ের বয়স বা যোগ্যতা অর্জন করতে অনেক দেরি আছে এখনও, কাজেই

উদ্রিক্ত লিঙ্গ ঘষতে ঘষতে কল্পনায় নানা রকম ছবি দেখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তোমার।

তেরো-চোদ্দতেই বেশির ভাগ ছেলে স্বমেহনে ওস্তাদ হয়ে যায়, কিন্তু মেয়েদের সময় লাগে একটু বেশি। সাধারণত ষোলো সতেরোর আগে মেয়েরা অতটা পাকে না—অন্তত এই কাজে নয়। অনেকটা প্রাকৃতিক তাগিদেই আসে এটা এই বয়সে। তাদের জানতে হবে কোন্ কোন্ অঙ্গের সাহায্যে স্নায়ুতন্ত্রীগুলোকে উত্তেজিত করে ধীরে ধীরে চরমানন্দের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। শিখে নিতে হবে কোন্‌টার কি অনুভূতি, কিসে কি হয়। অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতার জন্য ভগাঙ্কুরে সাধারণত হাত দেয় না মেয়েরা এই বয়সে। আশপাশে ঘষাঘষি করে ভগাঙ্কুরকে উত্তেজিত করে চরমানন্দ ঘটায়। খুব কম মেয়েই এই বয়সে যোনিপথ ব্যবহার করে। এখানে আগের একটা কথা বোধহয় আবার বলা উচিত—স্বমেহন বা সঙ্গম উভয় ক্ষেত্রেই নারীর যৌনানুভূতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তার ভগাঙ্কুর। ফ্রয়েডের ভুল মন্তব্যে প্রভাবিত হয়ে আমাদের দেশী বইয়ে অনেকে লিখেছেন এইভাবে স্বমেহনের ফলে নারী অসুখী হয় তার দাম্পত্য জীবনে, স্বামীর সাথে সঙ্গমে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না, ইত্যাদি। এসব ভুল কথায় কান দেয়ার কোন দরকার নেই। ক্ষতি শুধু অন্যায় বা পাপ-বোধটুকুই, আর কিছু নয়। আসলে স্বমেহনের মাধ্যমে স্বাভাবিক

প্রাকৃতিক নিয়মেই নারী নিজেকে সঙ্গমে চরমানন্দের উপযোগী করে নিচ্ছে। ক্ষতি তো হচ্ছেই না, বরং অনেক দিক থেকে লাভই হচ্ছে চাপা আবেগ, উচ্ছ্বাস আর উত্তেজনার বাষ্প প্রশমন হওয়ায়।

বয়স একটু বেশি হলে মেয়েরা যোনিপথে নানান কিছু ঢুকিয়ে স্বমেহন করে থাকে। সবচেয়ে সহজলভ্য জিনিসটার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি—আঙ্গুল। বিদেশে dildoe, ben-wa, vibrator ইত্যাদির ব্যবহার আছে। আমাদের দেশেও ইদানীং আসছে এসব জিনিস। Dildoe হচ্ছে প্লাস্টিক, রবার বা হাতির দাঁতের তৈরি নকল লিঙ্গ—কোন কোনটায় আবার চরম মুহূর্তে বীর্যস্খলনের মত গরম পানি স্খলনের ব্যবস্থা আছে। Ben-wa হচ্ছে জাপানী আবিষ্কার। ছোট রসগোল্লার মত এক ইঞ্চি ব্যাসের প্লাস্টিক বা স্টীলের দুটো বল। একটা ফাঁপা, অপরটা আধা-আধি পরিমাণ ভর্তি থাকে পারদ দিয়ে। ফাঁপা বলটা প্রথমে যোনিপথে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তারপর ঢুকানো হয় পারদ ভরা বলটা। এবার বিছানায় শুয়ে কিংবা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে কোমর দুলাতে শুরু করলে সামনে-পিছনে চলতে শুরু করে পারদ ভর্তি বলটা, বার বার গিয়ে টোকা খায় ফাঁপা বলটার গায়ে। ফলে কেঁপে কেঁপে ওঠে যোনিপথ, ভগাধারলঘু, ভগাঙ্কুর—দ্রুত চরমানন্দের শিখরে পৌঁছে যাওয়া যায়। পর পর বহুবার চরমানন্দ লাভ

করতে পারে নারী একই বৈঠকে এই পরিশ্রম বর্জিত স্বমেহনে। আর vibrator হচ্ছে ছোট্ট একটা বৈদ্যুতিক মোটর। ইলাস্টিক স্ট্র্যাপ দিয়ে হাতের তালুর পিছনে ওটা আটকাবার ব্যবস্থা আছে। সুইচ অন করে দিলে খুব দ্রুত কাঁপতে তাকে হাতটা। লিঙ্গই হোক, বা ভগাঙ্কুরই হোক সেই কম্পিত হাতে যেটাই ধরা যাবে সেটাও কাঁপতে থাকবে প্রবল বেগে—ফলে খুব অল্প সময়েই চরম-পুলক অবধারিত। মেয়েরা নানান ভাবে ব্যবহার করে থাকে ইলেকট্রিক ভাইব্রেটার। কেউ দুই আঙুলে ভগাঙ্কুর ধরেই সন্তুষ্ট, কেউ যোনিপথে এক বা একাধিক আঙ্গুল ঢুকিয়ে খুশি, কেউ আবার পছন্দ করে এক আঙ্গুল যোনিপথে ঢুকিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে হালকা ভাবে ভগাঙ্কুর স্পর্শ করে রাখতে।

এসব যন্ত্রপাতির সাহায্য নিলে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। নোংরা কাঠি, পেন্সিল বা পুরানো টুথব্রাশের চেয়ে এসব অনেক ভাল।

শরীরের তাগিদে স্বমেহন করায় বিন্দুমাত্র অন্যায় নেই। মনের তীব্র আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে মাঝে মাঝে মুক্তি না দিয়ে দমন করে রাখলে নিজেকে মানসিক রোগীতে পরিণত করা ছাড়া আর কোন লাভ হয় না। যাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সান্নিধ্য লাভ করার উপায় নেই, যেমন, জেলখানার বন্দী, বিধবা বা

বিপত্নীক বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা, অন্ধ—স্বমেহনকে তাদের মানসিক চাপ হালকা করবার ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। সঙ্গমের আনন্দ এতে হয় না, কিন্তু সঙ্গমের বিকল্প হিসেবে এটা তুলনাহীন।

আরও কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

দুর্ঘটনায় অণ্ডকোষ কাটা পড়লে কি হবে

সেটা নির্ভর করে কোন্ বয়সে কাটা পড়ল তার উপর। যদি তেরো-চোদ্দ বছরের আগেই ঘটনাটা ঘটে তাহলে তার যৌন জীবনের সেখানেই পরিসমাপ্তি। খোজা হয়ে গেল সে। লিঙ্গ বাড়বে না, শরীরে লোমের কমতি থাকবে, গলার স্বর পাতলাই থেকে যাবে। চিকন, লম্বা, ফ্যাকাসে হবে চেহারা।

কিন্তু বড় হয়ে কোন কারণে অণ্ডকোষ হারালে পঞ্চাশ ভাগ পুরুষের যৌন ক্ষমতা বজায় থাকে, বাকি পঞ্চাশ ভাগের বেলায় দ্রুত খোজা হয়ে যাবার লক্ষণ দেখা যায়—লিঙ্গের আকার ছোট হয়ে যায়, গায়ের লোম কমে যায়, যৌন অক্ষমতা দেখা দেয়, লিঙ্গ দাঁড়ায় না, চরম পুলক হয় না, বীর্যপাত হয় না।

দ্বিতীয় মাহাযুদ্ধে জার্মানদের পাতা মাইনের কল্যাণে যারা

অণ্ডকোষ হারিয়েছে তাদের ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে এ ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য আবিকৃত হয়েছে। যারা অণ্ডকোষ ছাড়াই মহানন্দে লিঙ্গ ব্যবহার করে যাচ্ছে তাদের ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে প্রথমে তো ঘাবড়েই গেলেন ডাক্তাররা। এ যেন তেল ছাড়াই গাড়ি চলা। কারও কারও বেলায় লিঙ্গোদ্রেক যদিও তত শক্ত ভাবে হচ্ছে না, যদিও সঙ্গমের ইচ্ছা কিছুটা কমে গেছে, কিন্তু কাজ তারা ঠিকই চালিয়ে নিচ্ছে, চরমানন্দও হচ্ছে, এমন কি বীর্যপাতও। অনুসন্ধানে ধরা পড়ল স্ত্রীর প্রেম ও সাহায্য-সহানুভূতি-উৎসাহ এদের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সেই সাথে এটাও ধরা পড়ল যে অণ্ডকোষ না থাকলেও শরীরের অন্য কোন উৎস থেকে টেস্টোস্টেরোন পাচ্ছে তারা।

খুঁজতে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল যে শুধু অণ্ডকোষই নয়, অ্যাড্রেনাল গ্ল্যাণ্ডও কিছুটা যৌন হরমোন উৎপাদন করে থাকে। যতটা করে, সেই সক্ষম পঞ্চাশ ভাগের ক্ষেত্রে সেটা যৌন সঙ্গম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট। এই তথ্য আবিষ্কারের ফলে সবাই উপকৃত হল। যারা সঙ্গমে অক্ষম হয়ে পড়েছিল, টেস্টোস্টেরোনের কিছু ট্যাবলেট বা ইঞ্জেকশন দিতেই নাটকীয় পরিবর্তন দেখা গেল তাদের মধ্যে। আবার স্বাভাবিক আকারে ফিরে এল লিঙ্গ, গলার স্বর মোটা হল, হারিয়ে যাওয়া সঙ্গমেচ্ছা করাঘাত শুরু করল মনের দরজায়,

লিঙ্গোদ্রেক, চরমানন্দ, বীর্যপাত—সবই ফিরে এল। যারা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যাণ্ডের সহযোগিতায় ঠেকার কাজ এতদিন চালিয়ে নিচ্ছিল, তারাও হরমোন ইঞ্জেকশনের ফলে ফিরে পেল পূর্ণ উদ্যম।

সুন্নৎ বা মুসলমানীর উপকারিতা

সুন্নৎ বা খাতনার ফলে প্রথমত পুরুষের সঙ্গমের আনন্দ অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। লিঙ্গ-মণির তুলনায় উপরের ত্বকে স্নায়ুর সংখ্যা অনেক কম। ত্বকাবরণ না থাকলে যোনির সাথে লিঙ্গ-মণির সরাসরি সংস্পর্শে অনেক বেশি সুখানুভূতি হয়।

দ্বিতীয়ত, লিঙ্গ-মণি ও ত্বকাবরণের মাঝখানে পনিরের মত এক ধরনের অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা (Smegma) জমে। ত্বকটা কেটে ফেললে এই ময়লা আর জমতে পারে না।

তৃতীয়ত, এই দুর্গন্ধময় ময়লার মধ্যে রোগ-জীবাণু বাসা বাঁধে ও দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে, এবং প্রায়ই লিঙ্গ-মণির ঘায়ে কষ্ট পেতে হয়। উপরের চামড়া ফেলে দিলে জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়।

চতুর্থত, লিঙ্গের ক্যানসারের একমাত্র চিকিৎসা ঃ যন্ত্রটা কেটে ফেলা। সুন্নৎ বা খাতনা করা লিঙ্গে এ পর্যন্ত ক্যানসারের আক্রমণ দেখা যায়নি। এর আক্রোশ শুধু খাতনা ছাড়া লিঙ্গের ওপর।

যৌন-বিকৃতি
কোন্‌টা

সাধারণত লিঙ্গ-যোনি সঙ্গমকে স্বাভাবিক ধরে নিয়ে আর সব রকম যৌন-আনন্দকেই আমরা বিকৃতি বলে আখ্যা দিতে চাই। এটা কিন্তু ঠিক নয়। আর যৌন-বিকৃতি থাকলেই কাউকে ম্যানিয়াক বা ভয়ঙ্কর বা অপ্রকৃতিস্থ ভাবারও কোন কারণ নেই। আসলে এরা যৌন-বিষয়ে অপরিণত—একটা বিশেষ অবস্থার পর আর সবার মত স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি, আটকে আছে একই জায়গায়।

যাই হোক, যৌন-বিকৃতি বলতে সাধারণত যা বোঝায় তা হচ্ছেঃ স্যাডিজম্, ফিটিশিজম, ম্যাসোকিজম ইত্যাদি। একজিবিশনিস্ট, ট্র্যান্সভেস্টাইট ও পিপিং টমকেও বিকৃত রুচির অধিকারী বলা হয়। নামগুলো ইংরেজিতে লিখলাম, কারণ এককথায় এসব শব্দের সহজ, ভাল বাংলা নেই।

পীপিং টম (PEEPING TOM)

পীপিং টমকে দিয়েই শুরু করা যাক। এদের মধ্যে রয়েছে মানুষের গোপন অঙ্গ দেখার প্রবণতা। সব শিশুর মধ্যেই রয়েছে এ ব্যাপারে অদম্য আগ্রহ। তিন-চার বছর বয়স হলেই ছেলে মেয়েরা একে অন্যের শরীর সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

ছেলেরা ভাবে, 'ব্যাপার কি! মেয়েদের কিচ্ছু নেই কেন?' মেয়েরাও তেমনি ভাবে, 'ওটা কি ঝুলঝুল করে ছেলেদের ওখানটায়?' সুযোগ পেলেই একে অন্যেরটা দেখবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু যে লুকিয়ে দেখবে তা নয়, খেলতে খেলতে মা-বাপের চোখের আড়াল হলেই বলে বসবে, 'তোরটা দেখা, তাহলে আমারটাও দেখাব।' এসব স্টেজ অবশ্য বেশির ভাগ ছেলে-মেয়েই দ্রুত পার হয়ে যায়। তারপর স্কুলে লক্ষ করে তারা একে অপরকে। তেরো-চোদ্দ বছরে যখন শরীরের নানান জায়গায় নানান পরিবর্তন শুরু হয়—তখন তো দারুণ আগ্রহে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে একে অপরের ওপর। এই দেখাদেখির কিন্তু শেষ নেই, পরিণত বয়সেও সঙ্গমের সময় একে অন্যের শরীর দেখা অত্যন্ত আনন্দের এবং খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

তাহলে পীপিং টমের দোষ কি? দোষ হচ্ছে, স্তরগুলো পার হয়ে সে বড় হয়ে উঠতে পারেনি, একটা জায়গায় থেমে আছে। তার দেখাটা পারস্পরিক দেখাদেখির পর্যায়ে যায় না কখনও, সঙ্গম পর্যন্ত গড়ায় না—সে শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে, উত্তেজিত হয়, আর হস্তমৈথুন করে। নারী সংসর্গ বা সঙ্গমের প্রতি তার বাস্তব কোন আগ্রহ নেই, সবই কল্পনা।

প্রায়ই দেখা যায় দর্শন সুখের খাতিরে মস্ত ঝুঁকি নিয়ে বসে পীপিং টমেরা। গভীর রাতে পাঁচিল ডিঙিয়ে অন্যের

বাড়িতে ঢুকে পড়ে কেউ কেউ, পাইপ বেয়ে উঠে যায় দোতলায় বা তেতলায় শুধু জানালার ফাঁক দিয়ে নগ্ন নারী বা সঙ্গমরত জুটির কার্যকলাপ দেখে উত্তেজিত হওয়ার জন্যে। এসব করতে গিয়ে চোর হিসেবে ধরা পড়ে মারধর খাওয়া থেকে শুরু করে জেল হাজত পর্যন্ত ঘুরে এসেছে অনেক পীপিং টম।

একজিবিশনিস্ট (EXHIBITIONIST)

পীপিং টম লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যের যৌনাঙ্গ দেখতে চায়, কিন্তু একজিবিশনিস্ট করে ঠিক তার উল্টোটা—প্রকাশ্যে নিজের যৌনাঙ্গ দেখাতে চায় বিপরীত সেক্সকে। সুযোগ পেলেই প্রকাশ্যে প্রস্রাব করতে বসে, জামা-কাপড় খুলে হস্তমৈথুন করে বা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে।

পথে ঘাটে এরা অশোভন ও অশালীন ব্যবহার করে মানুষের ঘৃণা ও বিরক্তিই উৎপাদন করে থাকে—আসলে এরা তেমন ক্ষতিকর এলিমেন্ট নয়। অপরিণত।

পীপিং টম শুধু ছেলেদের মধ্যেই পাওয়া যায়, কিন্তু, যদিও কম, মেয়েরাও একজিবিশনিষ্ট হয়ে থাকে। ক্যাবারে বা স্ট্রিপটীজ ডান্সার এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ট্র্যান্সভেস্টাইট (TRANSVESTITE)

বিপরীত লিঙ্গের জামা-কাপড় পরে যারা প্রকাশ্যে চলাফেরা করে তাদের বলে ট্র্যান্সভেস্টাইট। আমাদের দেশের এক ধরনের 'হিজড়া' এর একটা উদাহরণ। ভিন্ন লিঙ্গের জামা-কাপড় পরার বিরুদ্ধে যদিও কোন আইন নেই, এবং আধুনিক স্টাইলের নাম করে মেয়েরা বেশ পারও পেয়ে যায়—প্যান্ট-শার্ট-নেকটাই পরা, পুরুষের মত চুল ছাঁটা মেয়ে তো হর-হামেশা দেখা যায় রাস্তা-ঘাটে; কিন্তু ছেলেরা শাড়ি-ব্লাউজ-হাইহিল পরে রাস্তায় বেরোলেই ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে লেগে যায় পিছনে, হাসির রোল পড়ে যায় তাকে নিয়ে, আঙ্গুল দেখিয়ে বলা হয়ঃ যৌনবিকৃতির শিকার।

আমাদের দেশে কিছু কিছু পুরুষবেশী মেয়ে অবশ্য ধরা পড়েছে পুলিসের হাতে, কিন্তু সেটা যতটা না লুঙ্গি-শার্ট পরার জন্য, তার চেয়ে বেশি সন্দেহজনক আচরণের জন্য।

সব বিকৃতির মত এটারও উন্মেষ হয় শৈশবেই। ছয়-সাত বছর বয়সে মায়ের বা বড় বোনের জামা পরে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় ব্যাপারটা। কিছুদিনের মধ্যেই বেশির ভাগ শিশুরই দূর হয়ে যায় এই প্রবণতা, কিন্তু ট্র্যান্সভেস্টাইটদের ক্ষেত্রে যৌবনের প্রারম্ভে ফিরে আসে প্রবল ভাবে। এই সময় ওসব জামা-কাপড় পরে এক বিশেষ ধরনের

যৌন উত্তেজনা অনুভব করে তারা।

অনেকের মধ্যে এই বিকৃতি সারা জীবনই থেকে যায়—বিয়েশাদী করে দুই বাচ্চার বাপ হয়ে যাওয়ার পরেও। সাধারণত এদের স্ত্রীরা যখন এই অদ্ভুত প্রবণতার কথা প্রথম টের পায় তখন বেশ কিছুটা বিস্মিত হলেও চট করে বুঝে নেয় ব্যাপারটা স্বামীর কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে আপত্তি তো করেই না, উপরন্তু স্বামীর জন্যে ম্যাচ করা শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রা, লিপস্টিক এবং লেসের কাজ করা পেটিকোট কিনে আনে দোকান থেকে।

এরাও অপরিণত। শৈশবে প্রথমে শুরু হয় মাকে অনুকরণ, তারপর বাবাকে। যারা মায়েতেই আটকে গিয়ে আর এগোতে পারে না তাদের মধ্যেই জন্ম নেয় এই অদ্ভুত প্রবণতা।

ফিটিশিজম (FETISHISM)

ট্র্যান্সভেস্টাইটদের মত ফিটিশিস্টরাও মেয়েদের জামা-কাপড়ে আগ্রহী। তবে এরা সে কাপড় পরতে নয়, শুধু দেখে নাড়াচাড়া করেই উত্তেজিত হতে পছন্দ করে। কারও আকর্ষণ বক্ষাবরণের প্রতি, কারও পছন্দ পেটিকোট, কেউ সংগ্রহ করে পেন্টি, কেউবা টু বা ওয়ান পীস স্নানের পোশাক। এদের

কালেকশন দেখলে মাথা ঘুরে যাবে।

এইসব পোশাক দেখা ও নাড়াচাড়াই এদের যৌন উত্তেজনা ও লিঙ্গোদ্রেকের জন্য যথেষ্ট, নারীর বাস্তব উপস্থিতির কোন দরকার নেই। এরাও আসলে হস্তমৈথুন-বিলাসী। বিশেষ কোন অন্তর্বাসের মোহে পড়ে যায়, সেটার কোথায় মেয়েদের শরীরের কোন্ কোন্ অংশের স্পর্শ লাগে কল্পনা করেই ধাপে ধাপে উত্তেজনার চরম শিখরে আরোহণ করে এরা—তারপর স্বমেহনের মাধ্যমে উত্তেজনার প্রশমন ঘটায়।

কিছু কিছু ফিটিশিস্ট বিয়েও করে। কিন্তু মেয়েদের প্রতি নয়, তাদের অন্তর্বাসের প্রতিই তাদের আসল আকর্ষণ, যৌন সঙ্গমে যদিও বা লিপ্ত হয়, কোন না কোন পর্যায়ে তাদের পছন্দের বিশেষ অন্তর্বাসটির ভূমিকাই থাকে মুখ্য।

স্যাডিজম ও ম্যাসোকিজম (SADISM & MASOCHISM)

এর বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ধর্ষকাম ও মর্ষকাম। আসল কথা, যৌন ব্যাপারে কিছু মানুষ থাকে উৎপীড়নকামী, কিছু মানুষ থাকে অত্যাচারী মনোভাবাপন্ন—আতিশয্য হয়ে গেলেই সেটা পরিণত হয় রোগে।

নিষ্ঠুর একটা ভঙ্গি নেয় স্যাডিস্ট: প্রণয়িনীকে মারধোর না করলে যৌন-উত্তেজনা বোধ করে না। দুর্বলের উপর বল প্রয়োগ করে নিজের পৌরুষ জাহির করতে হয় এদের, অনেক

সময় হাত-পা বেঁধে তাদেরকে লিঙ্গ লেহনে বাধ্য করে। ম্যাসোকিস্ট করে তার উল্টোটা—প্রণয়িনীর হাতে তুলে দেয় চাবুক, আচ্ছা মত ধোলাই (পিট্টি) খেলে তবেই তাদের লিঙ্গোদ্রেক হয়।

নাম ও বর্ণনা শুনে মনে হতে পারে এরা না জানি কি সাংঘাতিক লোক বুঝি। আসলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা গোবেচারা কিসিমের মানুষ। মানুষ না বলে এদের ছেলেমানুষ বলাই উচিত, কারণ, এরাও অপরিণত। খেলা খেলা একটা ভাব রয়েছে এদের সবকিছুর মধ্যে। বেত, চাবুক, দড়ি, শিকল শুনতে ভয়ঙ্কর হলেও এরা যতটা না মারে বা মার খায় তার চেয়ে ভঙ্গি করে অনেক বেশি—এতেই তাদের আনন্দ। নইলে পরের সপ্তাহে একই লোকের কাছে আসত না একই মেয়ে।

কোন কোন স্যাডিস্ট-ম্যাসোকিস্ট যারা মারাত্মক মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, তারাই ধর্ষণ ও খুনের মাধ্যমে পত্রিকার চওড়া হেডলাইন তৈরিতে সাহায্য করে।

একজন স্যাডিস্ট যে চিরকাল স্যাডিস্ট থাকবে তার কোন মানে নেই। এই সপ্তাহে যে স্যাডিস্ট, পরের সপ্তাহে হয়ত দেখা যাবে সে ম্যাসোকিস্ট সেজে বসে আছে। যখন যা খেয়াল!

বেশ্যাবৃত্তির স্বরূপ

হাজার হাজার বছর ধরে এই পেশা চালু রয়েছে মানবসমাজে। বাইবেলেও এর উল্লেখ রয়েছে বহুবার। বোঝা যায়, অত আগেও পয়সার বিনিময়ে দেহ দান রীতিমত আকর্ষণীয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, এমন কি পবিত্র পেশা ছিল।

প্রাচীন কালে চীনা, গ্রীক, আর্মেনিয়ান, সিরিয়ান ও সাইপ্রিয়টদের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তিকে মহান পেশা বলে গণ্য করা হত। অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এরা ছিল অপরিহার্য সৌষ্ঠব। প্রায় প্রতিটি মন্দিরেই ছিল অনুমোদিত বেশ্যা, তাদের সঙ্গে টাকার বিনিময়ে যৌন কর্মে লিপ্ত হওয়াকে অনেকটা ধর্মকর্মের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। সামাজিক সম্মান লাভের জন্যে অনেক যুবতী স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে এই কাজে লিপ্ত হত, দুই-এক বছর সেবার পর সমস্ত উপার্জন মন্দিরকে (আসলে পুরোহিতকে) দান করে দিয়ে ফিরে যেত নিজ স্বামী বা বাপের সংসারে—গোটা পরিবারের জন্যে সেটা হত বিরাট এক সম্মান, পূণ্য ও মর্যাদার ব্যাপার।

কোন কোন দেশে মন্দির সেবার চেয়ে বাস্তব বুদ্ধিই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। প্রাচীন আর্মেনিয়া ও সাইপ্রাসে

যৌতুকের টাকা সংগ্রহের জন্য বাপ-মা উৎসাহিত করত অবিবাহিতা যুবতী মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তিতে।

ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে মন্দিরে 'সেবাদাসী' প্রথা আজও চালু রয়েছে।

আমাদের দেশেও এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত নওয়াব-রাজা-বাদশা-জমিদাররা নর্তকী-বাঈজী-বেশ্যা নিয়ে যে-সব কাণ্ড করেছে তা এখন শুনতে ন্যাক্কারজনক মনে হলেও তখনকার দিনে তা ছিল খুবই স্বাভাবিক ও সমাজস্বীকৃত।

এখনও বহু দেশে বেশ্যাবৃত্তি আর দশটা পেশার মত সহজ ও স্বাভাবিক পেশা হিসেবে স্বীকৃত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব-ইউরোপে একে প্রথম বেআইনী ঘোষণা করল কমিউনিস্ট সরকার। এর পর পরই ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম, জাপান ও আরও অনেক দেশে বেআইনী বলে ঘোষিত হল এ পেশা। এশিয়ার বেশির ভাগ দেশই অবশ্য নিয়ন্ত্রিত-বেশ্যাবৃত্তি স্বীকার করে নিয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার কিছু কিছু এলাকা ছাড়া দেশের সর্বত্রই অনিয়ন্ত্রিত পতিতাবৃত্তিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। মেক্সিকোতে এ কাজ রীতিমত আইনসম্মত পেশা।

রোগ, ধর্ম, আইন কোন কিছুর ভয়ই এ পেশাকে নির্মূল করতে পারেনি—সেই আদিকাল থেকে চলে আসছে এটা আজ পর্যন্ত।

কেন?

একমাত্র কারণঃ চাহিদা। চাহিদা আছে, তাই রয়েছে সরবরাহ। চাহিদা কেন? শুধু অবিবাহিত ছেলে-ছোকরা কিংবা বিপত্নীকেরাই ওসব গলিতে ভিড় জমায়? মোটেও না। এক হিসেবে জানা গেছে খরিদ্দারদের শতকরা সত্তর জনই বিবাহিত পুরুষ—বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে যারা রীতিমত সুখের সংসার করছে। এরা ওখানে এমন কিছু পায়, যা বাড়িতে স্ত্রীর কাছে পায় না। হ্যাঁ, সমাদর বা নতুনত্ব একটা কারণ বটে, কিন্তু মূলতঃ লিঙ্গ লেহনের জন্যেই ওখানে বিবাহিতদের ভিড়, স্ত্রীরা অসম্মতি জানালেই চলে যায় নিষিদ্ধ পল্লীতে। ভগাঙ্কুর লেহনও একটা বড় কারণ—আশ্চর্যের ব্যাপার, এতেও অনেক স্ত্রীর আপত্তি থাকে, চাহিদা পূরণের জন্যে পুরুষকে যেতে হয় বারবনিতার কাছে।

বেশ্যারা কি সঙ্গমের আনন্দ লাভ করে

না। খরিদ্দারদের সাথে সঙ্গমে তো মোটেই না। পেশাটাকে পেশা হিসেবেই দেখে এরা, আনন্দ বা আবেগ জড়িয়ে এটাকে জটিল করে তুলতে চায় না। অবশ্য ভান করতে অসুবিধে নেই; পুরুষ যখন খুশি হয়, নির্দ্বিধায় চরমানন্দের ভান করে

এরা। হাঁসফাঁস করে, জড়িয়ে ধরে, খামচি দেয়।

আসলে গোটা ব্যাপারটা যোনির অভ্যন্তরে স্বমেহনের মত। বেশ্যার সাথে খরিদ্দারের স্বার্থের সংঘাত রয়েছে। পয়সা উশুল করার জন্যে খরিদ্দার চায় যত বেশিক্ষণ পারা যায় আনন্দ নিংড়ে বের করতে; কিন্তু ওদিকে এত দেরি সহ্য হতে চায় না বারবনিতার—আরও উনিশ জনকে খুশি করতে হবে তার, এই ব্যাটাকে বিদায় করতে পারলে বাঁচে। লোকটি চায় মেয়েটি তার সাথে আনন্দে শরিক হোক, তার জন্যে কিছুটা আবেগ-বিহ্বল হোক, মেয়েটি এসব জটিলতা থেকে আত্মরক্ষা করে চরমানন্দের অভিনয় করে। দু'জনই বোঝে দু'জনের মধ্যেকার সম্পর্কটা কতখানি ফাঁকা, তবু একে অপরকে কাছে টানে—যতই বিদ্বেষ থাক, একটা যোনি দরকার পুরুষটির, মেয়েটিও ঘৃণা করে পুরুষকে, কিন্তু তার দরকার টাকাটা। আর কিছু না।

গর্ভপাত কি ও কেন

নির্ধারিত সময়ের আগেই গর্ভাবস্থার ইতি ঘটলে তাকে গর্ভপাত বলে।

গর্ভপাত দু'ধরনের—ইচ্ছাকৃত ও প্রাকৃতিক।

প্রাকৃতিক গর্ভপাত অনেক কারণেই ঘটতে পারে, তবে সাধারণত মা বা সন্তানের কিংবা উভয়ের শারীরিক ত্রুটির জন্যেই এটা ঘটে থাকে। প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শুক্রকীট বা ডিম্বের দোষে ত্রুটিযুক্ত ভ্রূণের জন্ম হলে প্রকৃতিই সেই ভ্রূণ বের করে দিয়ে সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করে। বাপ-মা হয়ত ভাবী সন্তান হারিয়ে দুঃখ পায়, কিন্তু এটা আসলে প্রকৃতির আশীর্বাদ। কারণ এ ধরনের প্রায় প্রতিটি ভ্রূণই পূর্ণতা লাভ করলে ভয়ঙ্কর-দর্শন রাক্ষস বা দৈত্য-দানোর মত দেখতে হত। কারও হয়ত মাথা নেই, কারও বা দুটো মাথা; কারও যদি বা মাথা আছে। তার মধ্যে মগজ নেই।

বাকি অর্ধেক প্রাকৃতিক গর্ভপাত ঘটে মায়ের রক্ত শিশুর শরীরে ঠিকমত সঞ্চালন না হলে। ডিমের সাথে শুক্রকীটের মিলনের পর যখন জরায়ুতে স্থান নেয় ভ্রূণ, সেই সময় মায়ের রক্তনালীর সাথে যুক্ত হয় ভ্রূণের শরীরের রক্ত চলাচল ব্যবস্থা। এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে যদি কোন ত্রুটি বা গোলমাল হয় তাহলে আগে হোক বা পরে হোক গর্ভপাত ঘটে থাকে।

কিন্তু স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক গর্ভপাতের চেয়ে ইচ্ছাকৃত গর্ভপাতের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। ইচ্ছাকৃত গর্ভপাতের মধ্যে একটা অংশ হচ্ছে থেরাপিউটিক অ্যাবরশন বা ভৈষজ গর্ভপাত—গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসের মধ্যে শিশু যদি জার্মান মিজল বা রুবেলা নামের ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে

একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে গর্ভপাত ঘটানো। এছাড়া বাকি সব গর্ভপাত হচ্ছে কুমারী বা বিধবা মায়ের অতি দুঃখের করুণ কাহিনী, মুহূর্তের ভুলের খেসারত; কিংবা বিবাহিতা রমণীর অসতর্কতা বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কাহিনী।

কিভাবে গর্ভপাত ঘটানো হয়

চিকিৎসাসম্মত উপায়ে গর্ভপাত ঘটাতে হলে প্রথমে যৌনাঙ্গের পশম চেঁছে ফেলে গোটা এলাকাটা অ্যান্টিসেপটিক ওষুধ দিয়ে মুছে নেয়া হয়। তারপর স্পেকুলাম (speculum) বলে একটা যন্ত্র যোনিপথে ঢুকিয়ে পথটা বড় করা হয়, যাতে জরায়ুর মুখ (cervix) পর্যন্ত পৌঁছতে অসুবিধা না হয়। এরপর জরায়ুর পেনসিলের সীস ঢোকার মত সরু মুখটাকে আরেকটা যন্ত্র ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে বড় করা হয়। দু'আঙুলের মত ফাঁক সৃষ্টি হলে কিউরেট (curette) বলে আরেকটা যন্ত্র ঢুকিয়ে দেয়া হয় জরায়ুর অভ্যন্তরে। যন্ত্রটা লম্বা একটা হ্যানডেলের মাথায় সার্জিকাল স্টীলের একটা বড়সড় ফাঁসের মত দেখতে। এই কিউরেট দিয়ে জরায়ুর ভেতরের দেয়ালটা আচ্ছামত আঁচড়ে দেবেন সার্জেন চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। উদ্দেশ্যঃ ভ্রূণটাকে দেয়ালের গা থেকে খসিয়ে আনা। ভ্রূণটা

খসে গেলে বেশ কিছুটা রক্তপাত হবে, গোটা যোনিপথে তুলো ঠেসে, খাবার জন্যে কয়েকটা ট্যাবলেট দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে রোগীকে। কয়েকদিনের মধ্যেই ঠিকঠাক হয়ে যাবে সব।

হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের পরিচ্ছন্ন পরিবেশে এই অপারেশন অত্যন্ত নিরাপদ—খারাপ কিছু ঘটার সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগেরও কম।

কিন্তু তা না করে কেউ যদি অশিক্ষিত হাতুড়ে লোকজনের পরামর্শে নিজে নিজেই জরায়ুর মধ্যে ক্যাথেটার বা কাঠি ঢুকিয়ে বাচ্চা খসাবার চেষ্টা করে, কিংবা আজেবাজে ওষুধ খায়—তাহলে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে; শিশুর সাথে তার মায়েরও মৃত্যু ঘটার প্রচুর সম্ভাবনা। কাজেই নিজে কিংবা অশিক্ষিত ধাত্রী বা হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে গর্ভপাতের চেষ্টা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ
পদ্ধতি

সন্তান উৎপাদন না করে সঙ্গম-সুখ চাইলে তোমাকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে জানতে হবে।

সেই আদিকাল থেকে মানুষ এর উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করে আসছে। চেষ্টা থামেনি আজও।

কোন কোন আদিবাসীদের মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্যে সঙ্গমের আগে কয়েকদিন পুরুষের অণ্ডকোষকে গরম পানিতে ভেজাবার প্রথা চালু আছে। তারা কিভাবে জানল বোঝা না গেলেও এটা যে একটা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮·৬ ডিগ্রী, কিন্তু শুক্রকীট জন্মাবার পক্ষে তাপমাত্রাটা একটু বেশি হয়ে যাওয়ায় অণ্ডকোষটা শরীরের একটা বিশেষ জায়গায় দোদুল্যমান অবস্থায় ঝোলার ব্যবস্থা করেছে প্রকৃতি, যাতে ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে জিনিসটার তাপ শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে

তিন-চার ডিগ্রী কম থাকে। পিল বা কনডোমের মত অতটা নির্ভরযোগ্য না হলেও গরম পানিতে অণ্ডকোষ শেঁক দিলে বেশ খানিকটা কমে যায় প্রজনন সম্ভাবনা।

আরেকটা প্রাচীন পদ্ধতি হচ্ছে (দুঃখের বিষয় অনেক অজ্ঞান নারী-পুরুষ এটা ব্যবহার করতে গিয়ে বিপদে পড়ছে আজও) ঠিক বীর্য স্খলনের পূর্ব মুহূর্তে ঝট করে লিঙ্গকে বাইরে বের করে ফেলা। এটাকে মোটেও কোন কার্যকরী পদ্ধতি বলা চলে না। প্রথম কারণ, বের করে ফেলবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সময় উপস্থিত হলে শরীরের অভ্যন্তরীণ তাগিদে নিজের উপর নিজের কর্তৃত্ব না থাকার সম্ভাবনা শতকরা ৭০ ভাগ। চরম মুহূর্তে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে যোনির ভিতরে স্খলন ঘটিয়ে বসে পুরুষ। দ্বিতীয় কারণ, বীর্য স্খলনের আগেই পুরুষের লিঙ্গমুখ দিয়ে দুই-এক ফোঁটা রস বেরিয়ে আসে, প্রতি ফোঁটায় থাকে কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার শুক্রকীট। কাজেই বীর্য স্খলন ভিতরেই হোক আর বাইরেই হোক দু'তিন ফোঁটা প্রাথমিক রসই সন্তান উৎপাদনের জন্যে যথেষ্ট। কাজেই কোন রকম নিয়ন্ত্রণ না করার চেয়ে এই নিয়ন্ত্রণ সামান্য ভাল, বেশি ভাল নয়।

এর চেয়ে আর একটু ভাল হচ্ছে দিন তারিখ দেখে সঙ্গম করা। সাধরণত ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার চোদ্দ দিন আগে মেয়েদের ওভুলেশন (ডিম্বস্ফোটন) হয়। এই সময়েই সন্তান

জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি। এই সময়ের আগে পিছনে দুই আর ছয় মোট আটদিন বাদ দিয়ে বাকি সময়ে সঙ্গম করলে সন্তান-সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। কিন্তু এই আন্দাজের উপর নির্ভর করাটা নিতান্তই বোকামি। কারণ, আগামী ঋতুস্রাব ঠিক কবে শুরু হবে সঠিক নির্ণয় করা সহজ নয়, ভুল হলেই গেল। তাছাড়া মাসের যে-কোন দিন, এমন কি ঋতুস্রাব চলাকালীনও ওভুলেশন হতে পারে।

এর চেয়ে আর একটু ভাল পদ্ধতি চালু আছে পূর্ব-ইউরোপীয় রমণীদের মধ্যে। বীর্যপাতের সাথে সাথেই সঙ্গীকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বসে পড়ে তারা মেঝেতে। যোনি পথে তর্জনী ঢুকিয়ে বার কয়েক পাক দিয়েই ঝট করে আঙুলটা বের করে আনে তারা বাইরে। ফলে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসে স্খলিত বীর্য। নিখরচার এই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নেহায়েত খারাপ নয়, কিন্তু পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। তার উপর রয়েছে বীর্য স্খলনের পর মুহূর্তে আলাদা হয়ে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা।

স্খলনের পর মুহূর্তে কোকাকোলার ডুশ চালু আছে বিদেশে। কোকাকোলার মধ্যে কার্বোনিক অ্যাসিড এবং চিনি থাকায় মারা পড়ে শুক্রকীটগুলো। ছয় আউন্সের বোতলে ঠিক একবার ব্যবহারের উপযোগী কোকাকোলা থাকে। কিন্তু এখানেও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় বলে সঙ্গমের তৃপ্তি

ব্যাহত হয়। এবং সবচেয়ে বড় অসুবিধা যেটা, সেটা হচ্ছে বীর্যপাতের সাথে সাথে কোকাকোলার ডুশ নিলেও এইটুকু সময়ের মধ্যে লাখ খানেক কীট ঢুকে পড়ে জরায়ু-মুখ দিয়ে— ওখানে পৌছবার ক্ষমতা নেই কোন ডুশেরই, তা সে যতই কড়া ওষুধের তৈরি হোক না কেন।

এছাড়াও ফোম, ডায়াফ্রাম, কনডোম, সারভিকাল ক্যাপ, ইত্যাদি নানান জিনিস প্রচলিত আছে। কিন্তু কোনটাকেই পুরোপুরি নিরাপদ বলার উপায় নেই। অনেকটা নিরাপদ, কিন্তু পুরোপুরি নয়।

নিরাপদ পদ্ধতি

মোটামুটি ভাবে নিরাপদ বলা যায় টিউবাল লাইগেশন, ভ্যাসেকটমি, কয়েল এবং পিলকে।

টিউবাল লাইগেশন হচ্ছে মেয়েদের ফ্যালোপিয়ান টিউব কেটে বেঁধে দেয়া। সবই ঠিক থাকে, কিন্তু ডিম আর শুক্রকীটের একসাথে হওয়ার জো থাকে না। খুবই সহজ অপারেশন, কিন্তু কেউ যদি মত পরিবর্তন করে আবার গর্ভবতী হতে চায়, কাটা টিউব জোড়া দেয়াটা আবার তেমনি কঠিন।

অণ্ডকোষ থেকে লিঙ্গে আসে শুক্রকীট ভ্যাস ডেফারেন্স্ নামে একটা ছোট্ট টিউবের মধ্যে দিয়ে। এই রাস্তাটা বন্ধ করে দিলে সবই ঠিক থাকবে, শুধু শুক্রকীটগুলো আটকা পড়বে অণ্ডকোষের ভিতর, বেরোতে পারবে না। ফলে সন্তান উৎপাদনের প্রশ্নই ওঠে না। দশ মিনিটের অপারেশন।

শতকরা চল্লিশ ভাগ ক্ষেত্রে ভ্যাসেকটমির পরেও আবার সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা ফিরে পেতে পারে পুরুষ আবার একটা ছোট্ট অপারেশনের মাধ্যমে।

পলিথিন প্লাস্টিক কয়েলও চমৎকার জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। আড়াই হাজার বছর আগে আরবরা আবিষ্কার করেছিল যে স্ত্রী-উটের জরায়ুতে একটা ছোট্ট পাথর ঢুকিয়ে দিলে তাদের বাচ্চা হওয়া ঠেকানো যায়। সেটারই আধুনিক রূপ হচ্ছে প্লাস্টিক কয়েল। দু'মিনিটের কাজ। এর অসুবিধে হচ্ছে, কারও কারও শরীরে এটা সহ্য হয় না। তাছাড়া শোনা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে ছোট্ট দু'হাতে প্লাস্টিক কয়েল নিয়ে বাচ্চা বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। একে শতকরা নব্বই ভাগ নিরাপদ বলা যেতে পারে।

দু'টি স্ত্রী হরমোনের সংমিশ্রণে তৈরি হয় কন্ট্রাসেপটিভ ট্যাবলেট—ঈস্ট্রোজেন আর প্রজেসটেরোন। নারীর শরীরে হরমোনের ভারসাম্য পাল্টে দিয়ে ওভুলেশন বা ডিম্বস্ফোটন বন্ধ করে দেয়া সম্ভব। ঠিকমত সেবন করলে শতকরা একশো ভাগ নিরাপদ। ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার পঞ্চম দিনে খেতে হয় প্রথম ট্যাবলেট, তারপর থেকে প্রতিদিন খেয়ে যেতে হয় একটা করে ট্যাবলেট আরও উনিশ দিন। বিশটা ট্যাবলেট শেষ করার তিন থেকে পাঁচদিনের মধ্যে আবার শুরু হয় ঋতুস্রাব, আবার পঞ্চম দিন থেকে শুরু হয় ট্যাবলেট সেবন।

ব্যবহার পদ্ধতি সহজ হলেও এর কিছু অসুবিধেও আছে। মাথা ঘোরা, বমি হওয়া, মোটা হয়ে যাওয়া, জনডিসে ভোগা, অ্যালার্জী, ইত্যাদি ছাড়াও আর একটা মস্ত অসুবিধে হচ্ছে রক্ত জমাট বেঁধে মৃত্যু! মস্তিষ্ক বা ফুসফুসে রক্ত জমাট বেঁধে মৃত্যুর সংখ্যা পিলসেবীদের মধ্যে অন্যান্যদের তুলনায় দশগুণ বেশি দেখা যায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ মাথা ঘামিয়ে আসছে বটে কিন্তু এখনও সবার জন্যে উপযোগী বা সবার গ্রহণযোগ্য কোন উপায় বের করা সম্ভব হয়নি। সবকিছুতেই কিছু না কিছু অসুবিধে রয়ে গেছে। এই অসুবিধেগুলো স্বীকার করে নিয়েই যার পক্ষে যে পদ্ধতি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে, সে সেটা ব্যবহার করছে।

আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এমন কিছু উপায় আবিষ্কৃত হবে যেটা ব্যবহারে কারও কোন অসুবিধে হবে না, অথচ নিরাপত্তা থাকবে শতকরা একশো ভাগ।

ছেলে চাই,
না মেয়ে

আমাদের দেশে ভয়ানক হারে বাড়ছে লোক-সংখ্যা। এখনই আশু ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামী কয়েক বছরেই দ্বিগুণ

হয়ে যাবে এদেশের লোক-সংখ্যা। একে অনুন্নত গরীব দেশ, তার উপর এই জন-সংখ্যার চাপ পড়লে ভেঙে পড়বে জাতির মেরুদণ্ড। তাই পরিবার পরিকল্পনার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সরকারীভাবে। অসংখ্য কর্মী কাজ করছেন জনসাধারণকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্যে, অজ্ঞানতা দূর করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন এর প্রকৃত তাৎপর্য। অশিক্ষা দূর করতে হবে, গর্ভপাত বৈধ করতে হবে, অতি-ধর্মান্ধতা দূর করতে হবে—কাজ অনেক, অনেক সমস্যা। তাঁদের কাজ তাঁরা করুন, আমরা আর একটা দিকে কিছুটা আলোকপাত করেই শেষ করব এই পরিচ্ছেদ।

জনসংখ্যা সমস্যা এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষিত দম্পতি একটার পর একটা সন্তান উৎপাদন করে চলেন ছেলে বা মেয়ের আশায়। হয়ত ছেলে হচ্ছে তো হচ্ছেই, পর পর তিনটে ছেলে হয়ে গেল, অথচ স্বামী বা স্ত্রীর মেয়ের শখ। এক্ষেত্রে মেয়ের জন্যে আর একটি চান্স নিতেই হয়। দেখা গেল চতুর্থটাও ছেলে। তখন? তখন শেষ চেষ্টা হিসেবে আর একটি সন্তান জন্ম দিতেই হয়। এইবার ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, দেখা যাবে পাঁচ-পাঁচটা সন্তান হয়ে বসে আছে, অথচ শুরুতে হয়ত স্বামী-স্ত্রীর পরিকল্পনা ছিল দুটো সন্তান নিয়ে ছোট পরিবার সুখী পরিবার রচনা করবে। যাদের শুধুই মেয়ে হয়ে চলেছে,

অথচ ছেলের শখ, তাদের বেলায়ও এই একই অসুবিধে দেখা দিতে পারে।

যারা ছেলে চায় তারা যদি ছেলে পেয়ে যেত, আর যারা মেয়ে চায় তারা যদি ঠিক সময় মত মেয়ে পেয়ে যেত তাহলে এই দুটি পরিবারের সন্তানের সংখ্যা দশ না হয়ে হয়ত হত চার। ছয়টি অযাচিত সন্তান হল শুধু বাপ-মা নিজেদের ইচ্ছেমত ছেলে বা মেয়ে জন্ম দিতে পারেনি বলে।

এর কি কোন উপায় আছে? ইচ্ছে করলেই কি কেউ ছেলে বা মেয়ের জন্ম দিতে পারে? অর্থাৎ, ছেলে হবে না মেয়ে হবে সেটা কি আগে থেকে নির্ধারণ করা সম্ভব? গর্ভধারণেরও আগে?

ডক্টর ল্যানড্রাম বি, শেট্‌ল্‌স্ বলছেন, শতকরা পঁচাশি থেকে নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব। তিনি তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করে দিয়েছেন কলাম্বিয়ার শত শত দম্পতির উপর এই নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করে। গবেষণার ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে আমি সহজ ভাষায় বলে যাচ্ছি নিয়মগুলো। খুবই সহজ।

ছেলে চাইলে

ডিম্বস্ফোটন বা ওভুলেশনের দিন বা কাছাকাছি সময়ে সঙ্গম করতে হবে। পর পর তিন দিন। তিন পোয়াটেক পরিষ্কার

পানিতে বড় চামচের দুই চামচ বেকিং সোডা পনেরো মিনিট ধরে গুলে প্রতিবার সঙ্গমের আগে স্ত্রীর যোনিপথে ডুশ দিতে হবে। স্বামীর আগেই স্ত্রীর চরমানন্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যোনিপথের গভীরতম অংশে বীর্যপাত হওয়া উচিত। এই তিন দিনের পর থেকে ঋতুস্রাবের আগে পর্যন্ত পুরুষকে সঙ্গমের সময় কনডোম ব্যবহার করতে হবে। ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার দিন থেকে ডিম্বস্ফোটনের দিন পর্যন্ত সঙ্গম বর্জনীয়, অন্য কোন উপায়েও পুরুষের বীর্যপাত হওয়া উচিত নয়, কারণ, ওভুলেশনের দিন বীর্যের মধ্যে যত বেশি শুক্রকীট থাকে ততই ভাল।

মেয়ে চাইলে

ডিম্বস্ফোটনের তিন দিন আগেই বন্ধ করতে হবে সঙ্গম। সপ্তাহ খানেক বিরাম দিয়ে আবার মেহনত শুরু করা যেতে পারে। তিন পোয়াটেক পরিষ্কার পানিতে বড় চামচের দুই চামচ সেরকা (হোয়াইট ভিনিগার) মিশিয়ে প্রতিবার সঙ্গমের আগে স্ত্রীর যোনিপথে ডুশ দিতে হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর চরমানন্দ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যোনি মুখের কাছাকাছি বীর্যস্খলন হওয়া উচিত। ওভুলেশনের আগে-পরে তিন-চার দিন করে বাদ দিয়ে সারা মাস সঙ্গমে কোন বাধা নেই।

কেন এ নিয়ম

শুক্রকীট দুই প্রকার—পুরুষ-কীট ও স্ত্রী-কীট।
যোনি-পথে বীর্যপাত ঘটার সাথে সাথেই কয়েক কোটি শুক্রকীট প্রাণপণ সাঁতার কেটে সামনে এগোতে শুরু করে। সবার লক্ষ্য জরায়ুর সেই ডিমটি। প্রত্যেকটি কীট চাইছে ডিমের সাথে মিলিত হয়ে ভ্রূণে পরিণত হতে, কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব হয় না সেটা।

শুক্রকীটের জন্যে যোনিপথ হচ্ছে দুর্গম এক সঙ্কট-সঙ্কুল রাস্তা। এই যাত্রা পথে লাখ-লাখ, কোটি-কেটি কীট মারা পড়ছে বেশুমার। ডিমের কাছে শেষপর্যন্ত গিয়ে মিলিত হয় শুধু একটি কীট। সেটি পুরুষ-কীট হলে সন্তান হবে ছেলে, আর যদি সেটা স্ত্রী-কীট হয় তাহলে সন্তান হবে মেয়ে।

সঙ্গমের আগে বেকিংসোডা-পানির ডুশ দিলে পুরুষ কীটের পক্ষে জরায়ুতে পৌঁছে ডিমের সাথে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় শতকরা পঁচাশি ভাগ। আর সেরকা-পানির ডুশ দিলে যোনিরন্ধ্রে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে স্ত্রী কীটের পক্ষে ডিমের সাথে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় শতকরা পঁচাশি ভাগ।

পরিষ্কার?

অশ্লীল সাহিত্য

গ্রীক pornos মানে নোংরা আর graphos মানে লেখা— এর থেকেই নেয়া হয়েছে ইংরেজি শব্দ pornography। বাংলা মানে, নোংরা লেখা বা অশ্লীল সাহিত্য। নোংরা ছবিকেও এর একটা শাখা হিসেবে ধরা যায়। যেসব দেশে এসবের বিরুদ্ধে কড়া বিধি-নিষেধ রয়েছে সেসব দেশে এর খুব প্রসার দেখা যায়।

উলঙ্গ স্ত্রীলোকের ছবির মধ্যে বেশিক্ষণ মুগ্ধ হয়ে থাকা যায় না এইজন্যে যে একবার দেখা হয়ে গেলে জানা হয়ে যায় সব। নিতম্ব, স্তন, ভগাধার, ভগাঙ্কুর, যোনি পথ একবার দেখা হয়ে গেলেই কৌতূহলের পরিসমাপ্তি ঘটে। কারণ, সব মেয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই কম বেশি একই রকম।

এরপরই আসে নারী-পুরুষের সঙ্গমের চিত্র। বিভিন্ন ভঙ্গিতে তোলা কদাকার চিত্রগুলোও একবার দু'বার দেখার পরই আকর্ষণ হারিয়ে কেমন মলিন হয়ে যায়। সঙ্গমের ছিয়ানব্বই ভঙ্গি দেখতে দেখতে বিরক্তিই লেগে যায় দর্শকের কাছে। নোংরা, একঘেয়ে মনে হয় সব।

এর চেয়ে আরেক ধাপ এগিয়েছে নীল ছায়াছবি। কিন্তু এসবের মধ্যে সৌন্দর্যবোধের অভাব এতই কুৎসিত ভাবে প্রকট যে অল্পক্ষণেই উৎসাহ হারাতে বাধ্য হয় দর্শক।

নোংরা লেখার ব্যাপারেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কিছুক্ষণ পড়ার পরই একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে যোনি পথে লিঙ্গ প্রবেশের বর্ণনা যত ভাবেই দেয়া হোক না কেন, কাজটা তো একই। কয়েক পাতা পড়ার পর আর এগোনো যায় না।

তবু কেনে কেন এসব মানুষ? সঙ্গমের সুযোগ যারা পায় না বা চায় না তারা এসব অশ্লীল বই-পুস্তক আর ছবির মধ্যে অন্য এক কাল্পনিক জগৎ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে এসব ব্যবহৃত হয় স্বমেহনের সময়। পুরুষ খদ্দেরই বেশি, মেয়েরা এসবে খুব একটা মজা পায় না।

অনেকের ধারণা নোংরা ছবি বা অশ্লীল সাহিত্য যৌন অপরাধের জন্য দায়ী। এই ধারণার যৌক্তিকতা বা সত্যতা প্রমাণ হয়নি আজ পর্যন্ত। কখনও কখনও কোন কোন যৌনবিকারগ্রস্ত অপরাধীর ঘরে নগ্ন নারীর ছবি বা নোংরা বই পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু এতেই একথা প্রমাণ হয় না যে এসব দেখে বা পড়ে সে বিকারগ্রস্ত হয়েছে। তার ঘরে এসব ছাড়াও হয়ত ছিল একখানা মোটাসোটা অক্সফোর্ড ডিকশোনারী, বা ধর্মগ্রন্থ, কিংবা রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা।

অনেক মনস্তত্ত্ববিদ ও পুলিস অফিসার মনে করেন নোংরা ছবি ও লেখায় ক্ষতি হওয়া তো দূরে থাকুক বরং এগুলো যৌন বিকারগ্রস্ত অপরাধীদের উত্তেজনা নিবৃত্ত করার কাজে লাগে।

অনেকটা ওষুধের মত। ছবি ও লেখার মধ্যে দিয়ে তাদের যৌন বিকৃতির চাপা বাষ্প অনেকখানি বেরিয়ে যায় বলে জ্যান্ত মানুষের উপর আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায় অনেকখানি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এসব যদি ক্ষতিকর না হয়, যৌন অপরাধের মাত্রাও না বাড়ায়, তাহলে এসব নিষিদ্ধ করায় লাভ কি? ঠিক বোঝা মুশকিল। শুধু একটা ব্যাপার বোঝা যায়, এর ফলে প্রচুর পরিমাণে লাভ হচ্ছে পর্ণোগ্রাফ বিক্রেতাদের। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি। আদম-হাওয়ার দৃষ্টান্ত তাঁদের সন্তানদের নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ একবিন্দু কমাতে পারেনি; তাঁদের মধ্যে যে পরিমাণে ছিল, আমাদের মধ্যেও ঠিক ততটাই রয়েছে।

ডেনমার্কে এসবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার সাথে সাথেই দেখা গেল ঝপ করে বিক্রি পড়ে গেল শতকরা চল্লিশ ভাগ। নিষেধাজ্ঞা না থাকলে মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণও দূর হয়ে যায়।

তবে কি অপরিণত কিশোর-কিশোরীকে এর কু-প্রভাব থেকে রক্ষার জন্যেই এই নিষেধাজ্ঞা? হতে পারে। কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে কোথায়? তাদের হাতে এ জিনিস পৌঁছুচ্ছে না এমন তো নয়। নিষেধাজ্ঞার সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীদের ফুলে ফেঁপে ওঠার সুবিধে করে না দিয়ে আমাদের কিশোর-কিশোরীদের যৌন বিষয়ে যথার্থ শিক্ষিত করে তোলাটা কি

শারীরিক পরিবর্তন

অনেক কিছুই জানা হল তোমার। এবার জেনে নাও তোমার যৌন জীবনের ভবিষ্যৎ। নইলে বার্ধক্যে পা দিয়ে যে প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে সেটা সহ্য করা মুশকিল হয়ে যাবে তোমার পক্ষে। আগে থেকেই জেনে রাখা ভাল তোমার চল্লিশোত্তর যৌনজীবনের রূপটা।

প্রকৃতি মানুষের আয়ু বেঁধে দিয়েছিল ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর। পাঁচ লক্ষ বছর আগে মানুষ যখন লোয়ার প্লিস্টোসিন যুগ ছেড়ে মিড্‌ল প্লিস্টোসিন যুগে পদার্পণ করছে, তখনই নির্ধারিত হয়ে গেছে তার আয়ু। ফলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এমনভাবে গঠিত হয়েছে যাতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর কোনরকম গোলমাল না করে রীতিমত সক্রিয় থাকে এবং তার পরেও আরও কয়েকটা বছর এসব দিয়ে ঠেকার কাজ চালানো যায়। ঠিক সময় মত পটল তুললে কোন সমস্যা ছিল না, কিন্তু

মাঝখান দিয়ে গোল বাধিয়ে বসেছে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান। প্রায় সব রোগেরই এমন সব ওষুধ বের করে বসে আছে যে সহজে মরবার উপায় নেই—মানুষের আয়ু বেড়ে গেছে প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু অভ্যন্তরীণ কলকজার মৃত্যু ঠেকাবার সাধ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের নেই। অন্তত এখন পর্যন্ত নেই। ফলে একটা বিশেষ বয়সে এসে অকেজো হয়ে যাচ্ছে অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি, এবং স্বাভাবিক যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার পরও আরও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বেঁচে থাকতে হচ্ছে আমাদের।

মেয়েদের কথা ধরা যাক আগে, তারপর আমরা আসব পুরুষের কথায়। কারণ বার্ধক্যের এই ছায়াটা মেয়েদের উপরই পড়ে আগে, তারাই প্রথম উপলব্ধি করে যে বয়স হয়ে গেছে। অন্তত এই ব্যাপারটায় প্রকৃতি 'লেডিস ফার্স্ট'র ভদ্রতা রক্ষা করেছে।

বার্ধক্যে নারী

চল্লিশ পেরোলে নানান ধরনের পরিবর্তন শুরু হয়ে যায় নারীর শরীরে। বাহ্যতঃ দেখা যায় ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়াটাই, কিন্তু অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন আরও অনেক ব্যাপক। বয়স হয়ে গেলে মেয়েদের ওভারি বা ডিম্বকোষে রক্ত চলাচল কমে যায় এবং ধীরে ধীরে মৃত্যু ঘটে এই অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গটার। তার ফলে কি হয়? নারীর নারীত্ব নির্ভর করে যে হরমোনের উপর সেই ঈস্ট্রোজেন তৈরির কারখানাটাই বন্ধ হয়ে গেল। এই হরমোন একফোঁটা একফোঁটা করে রক্তের সাথে মেশে বলেই নারী তার বিশেষ দৈহিক গঠন লাভ করে। এরই প্রভাবে বয়ঃসন্ধি কালে মেয়েদের স্তন বেড়ে ওঠে, নিতম্ব প্রশস্ত হয়, চেহারায় লাবণ্য ও লালিত্য আসে। এর প্রভাবে মেয়েদের শরীরে রোমের স্বল্পতা। এরই প্রভাবে নারীর জননেন্দ্রিয়ের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। পিটুইটারি

গ্ল্যাণ্ডের তৈরি গোনাডোট্রোপিন হরমোনের তদারকিতে ডিম্বকোষ তৈরি করে এই ঈস্ট্রোজেন হরমোন। ঋতুস্রাবের সময়কালের সাথে সাথে ঈস্ট্রোজেন তৈরির পরিমাণ ওঠা-নামা করে। প্রতি মাসে মেয়েদের শরীরের ঈস্ট্রোজেনের মাত্রা প্রায় শূন্যের কোঠা থেকে বাড়তে বাড়তে চলে যায় প্রাচুর্যের কোঠায়, তারপর আবার নেমে আসে প্রায় শূন্যে। এই ওঠা-নামাই নারী চরিত্রকে এতখানি দুর্বোধ্য করে তোলে পুরুষের কাছে। শরীরে এই হরমোনের পরিমাণ যখন বেশি থাকে তখন শান্ত, সন্তুষ্ট, আত্মবিশ্বাসী একটা ভাব আসে মেয়েদের মধ্যে, যখন কমে যায় তখন তারা অস্থির খিটখিটে এবং ঝগড়াটে হয়ে ওঠে। তার কামনার জোয়ার-ভাটা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও অনেকখানি নির্ধারিত হচ্ছে এই হরমোনের প্রভাবে। মোট কথা, ডিম্বকোষ কাজ বন্ধ করলেই মৃত্যু ঘটে নারীর নারীত্বের।

তোমার মাকে প্রায়ই বলতে শুনি—আর সাত আটটা বছর কোনমতে কেটে গেলে বাঁচি, কোন ঝামেলা নেই, বাচ্চা হওয়ার ভয় নেই, একেবারে ফ্রী হয়ে যাব তখন। কিন্তু আর কয়েক বছর পরে যখন সত্যি সত্যিই পরিবর্তন শুরু হবে, তখন চমকে উঠবে ও তার ভয়ঙ্করত্ব দেখে। পোড়া ময়মনসিঙা বেগুনের মত চুপসে যাবে বুক, শরীরের উপর-অংশের সব চর্বি গিয়ে জমবে কোমরে, গায়ের চামড়া কুঁচকে

গিয়ে শুকনো খসখসে হয়ে যাবে, যোনিপথ সঙ্কুচিত হয়ে আসবে ক্রমে, বাড়তে শুরু করবে ভগাঙ্কুরের আকৃতি, গায়ে-হাতে-মুখে রোম দেখা দেবে, গলার স্বর মোটা হয়ে যাবে আমার মত, দূর হয়ে যাবে সঙ্গমের ইচ্ছা, প্রচণ্ড এক মানসিক অবসাদে ছেয়ে ফেলতে চাইবে তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব, মেজাজের পরিমাণ (এখনই সাংঘাতিক!) বেড়ে যাবে কয়েক গুণ, রাতের পর রাত জাগতে হবে নিদ্রাহীনতায়। শুধু এই নয়, এই সাথে রয়েছে শরীরে অসম্ভব জ্বালা-পোড়া। ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার সময় এই জ্বালা-পোড়ার সম্মুখীন হতে হয় প্রায় সব নারীকেই। মনে হয় সারা শরীর থেকে গরম ভাপ বেরোচ্ছে। দিনের মধ্যে অন্তত তিন-চারবার আসবে এই জ্বালাপোড়া। ইচ্ছে হবে বরফের উপর গড়াগড়ি করি।

যাই হোক, এ সবকিছুর মিলিত প্রভাব ভয়ঙ্কর রকম ভারাক্রান্ত করে নারীর প্রৌঢ়ত্বের প্রথম পদক্ষেপকে। শূন্যতায় ভরে যায় তার সবকিছু, নিজেকে আবর্জনার মত অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। সব রস শুকিয়ে গিয়ে একেবারে পুরুষের মত শুষ্কং কাষ্ঠং। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া বেঁচে থাকার আর কোন অর্থ নেই তার কাছে। মনে মনে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে সে, মেনে নিয়েছে, হেরে গেছে সে বার্ধক্যের কাছে।

ভুলটা এখানেই। আসলে কিন্তু হেরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে থাকলে, এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের

সাহায্য নিলে সে যে তার নারীত্ব ফিরে পেতে পারে, যতিদন খুশি বজায় রাখতে পারে, এ খবর রাখে ক'জন নারী?

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান তার আয়ু দ্বিগুণ করে দিয়ে তাকে মস্ত অসুবিধায় ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থাও তো দিয়েছে।

কি রকম? ঈস্ট্রোজেনের কারখানা তার চালু করবার উপায় নেই, যা গেছে সেটা গেছেই। কিন্তু বাইরের থেকে যদি প্রয়োজনীয় হরমোনের সরবরাহ ঠিক রাখা যায় তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা ভোজবাজির মত পাল্টে যাবে আবার। এতে বয়স কমবে না, কিন্তু এ ছাড়া আর প্রায় সবই ফিরে আসবে নারীর শরীরে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কেমন যেন অন্য রকম লাগতে শুরু করবে সবকিছু আবার। গলার স্বর পাতলা হয়ে যাবে, শরীরে রোমের প্রাদুর্ভাব দূর হয়ে যাবে, মসৃণ হয়ে যাবে আবার গায়ের চামড়া, স্তনের আয়তন বাড়বে, যোনিপথ এবং ভগাঙ্কুর ফিরে পাবে আগের আকার। সবচেয়ে বড় কথা, কেমন রঙিন মনে হবে আবার দুনিয়াটা। ফিরে আসবে পুরুষের সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা, প্রেম। এতে দোষের কিছুই নেই। খাওয়া, পরা, প্রেম দোষের হতে পারে না কোন বয়সেই।

উপযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ইঞ্জেকশন বা ট্যাবলেট যা খুশি ইস্তেমাল করা যায়। দাম বেশি নয়।

একমাত্র স্তন বা জরায়ুতে যাদের ম্যালিগন্যান্ট টিউমার আছে তাদের জন্যে ঈস্ট্রোজেন নিষিদ্ধ। কারণ এতে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে সেটা। কিন্তু যাদের নেই, তাদের জন্যে সুখবর—রক্তের মধ্যে ঈস্ট্রোজেনের সরবরাহ থাকলে স্তন বা জরায়ুতে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, হৃদরোগের সম্ভাবনাও কমে যায় অনেকখানি, করনারি থ্রম্বসিসের আশঙ্কা কমে যায়, গেঁটেবাত হয় না। আর একটা রোগ থেকে রক্ষা করে মেয়েদের এই হরমোন—সেটা হচ্ছে Osteoporosis। অদ্ভুত এই রোগটা। প্রায়ই দেখা যায় মেরুদণ্ড বাঁকা হতে হতে একেবারে কুঁজো হয়ে নুয়ে পড়ে বৃদ্ধারা। শরীরে হরমোনের অভাব হলে হাড়ের মধ্যে ক্যালশিয়াম ও ফসফরাসের ঘাটতি হয়, ফলে খুব দুর্বল হয়ে যায় হাড়। শরীরের ওজনের চাপটা মেরুদণ্ডের উপরই পড়ে বলে এখানেই ক্ষতিটা হয় সব চেয়ে বেশি। একটার পর একটা ভাঙতে থাকে মেরুদণ্ডের হাড়। এই ভাঙাটা এত ধীরে ধীরে ঘটে যে তেমন কোন ব্যথা উপলব্ধি করা যায় না। ভাঙতে ভাঙতে একেবারে নুয়ে পড়ে পিঠ। এই ভাঙা হাড় মেরামত করতে পারে না ঈস্ট্রোজেন হরমোন, কিন্তু খুব সহজেই ভাঙা বন্ধ করে দিতে পারে।

গরম ভাপ বা জ্বালাপোড়া দূর করার জন্যে ঈস্ট্রোজেনের সাথে সামান্য পরিমাণে পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরোনও যোগ করে দেয় অনেক ডাক্তার। মেয়েদের অ্যাড্রেনাল গ্ল্যাণ্ড

নিয়মিত ভাবে টেস্টোস্টেরোন হরমোন তৈরি করে। এটার প্রভাব দমিয়ে রাখার জন্যে প্রচুর পরিমাণে ঈস্ট্রোজেন থাকা দরকার শরীরে। এর অভাব ঘটলেই পুরুষের মত দাড়ি-গোঁফ গজানো, ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয় মেয়েদের শরীরে। কিন্তু বয়স বেশি হয়ে গেলে ডিম্বকোষের মত অ্যাড্রেনাল গ্ল্যাণ্ডও ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে, এর থেকে টেস্টোস্টেরোন উৎপাদনও কমে যায়। ফলে শুধু ঈস্ট্রোজেন দিলে চলে না, পরিমিত পরিমাণ টেস্টোস্টেরোনও দিতে হয় প্রয়োজন হলে। এই হরমোনের ব্যবহারে তীব্রতর হয় যৌন বাসনা। প্রৌঢ় বয়সে এর প্রয়োজন আছে। ঈস্ট্রোজেন এবং টেস্টোস্টেরোন—এই দু'টি হরমোনের যথার্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ ঘটলে আশি-নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত নারী তার নারীত্ব ও কমনীয়তা বজায় রাখতে পারে।

পুরুষের বার্ধক্য

এতক্ষণ মেয়েদের ব্যাপারে আলোচনা করতে দেখে ভেবো না বিপদ-আপদ যা কিছু ওদের উপর দিয়েই যাবে, তুমি যেমন আছো তেমনি থাকবে চিরদিন। সেটি হচ্ছে না। পুরুষের বেলায় ব্যাপারটা আরও একটু জটিল।

মেয়েদের ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া আর গা-হাত পা জ্বালাপোড়া দেখে সহজেই বোঝা যায় তারা পা দিল প্রৌঢ়ত্বে। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা খুব ধীরে ধীরে আসে বলে সহজে ধরা পড়ে না রোগ, ভুল চিকিৎসা চলতে পারে অনর্থক।

পুরুষের প্রথম বার্ধক্যের লক্ষণ হচ্ছে লিঙ্গোদ্রেক না হওয়া। খুব ধীরে ধীরে লিঙ্গের দৃঢ়তা কমতে থাকে বলে ব্যাপারটা টের পেতে দেরি হয়ে যায় অনেক। ভিটামিন বা মৃতসঞ্জীবনী খেয়ে যখন কোন উপকার হয় না তখন পুরুষ

ছোটে ডাক্তারের কাছে। কেউ কেউ আবার ব্যাপারটা স্ত্রীর দোষে ঘটছে ধরে নিয়ে অন্য নারী সঙ্গমের প্রয়াস পায়। নতুন কারও সাথে সঙ্গমে প্রথম প্রথম বেশ সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু তারপর যে কার সেই। দিনের পর দিন অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে থাকে, উপায়ান্তর না দেখে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় শেষ কালে। অনভিজ্ঞ ডাক্তার হলে একগাল হেসে বলবে—বয়স হয়ে গেছে, আর কত? এবার মেশিনটাকে একটু বিশ্রাম দিন। অভিজ্ঞ ডাক্তার কি বলবে সেটা বর্ণনার আগে লক্ষণগুলো আরও একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

শুধু যে যৌন অক্ষমতা আসবে তাই নয়, বার্ধক্য এসে গেলে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষের আকার ছোট হতে শুরু করবে। আড্রেনাল গ্ল্যাণ্ড অবশ্য কিছু কিছু তৈরি করে থাকে, কিন্তু পুরুষের পৌরুষ রক্ষার জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় হরমোন টেস্টোস্টেরোন তৈরির কারখানা আসলে তার অণ্ডকোষ। প্রতিদিন কয়েক ফোঁটা করে এই হরমোন রক্তের সাথে না মিশলে তার দাড়ি-গোঁফ গায়ের রোম, দৃঢ় পেশী, মানসিকতা, এক কথায় তার পৌরুষ রক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে কমতে শুরু করে উৎপাদন, মারা যায় অণ্ডকোষের সমস্ত কোষগুলো একে একে। এর ফলে শুধু যে লিঙ্গোদ্রেকই বিঘ্নিত হয় তা নয়, যৌন কামনাও দূর হয়ে যেতে থাকে ক্রমে। ভয় পেয়ে গিয়ে অনেক সময় এই অবস্থায় বেশি করে সঙ্গম

করবার চেষ্টা করে পুরুষ। প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যেমন ছিল তেমনি আছে তার পৌরুষ। প্রথমে স্ত্রীর উপর পৌরুষ ফলাতে গিয়ে যদি বিফল হয় তাহলে সে চেষ্টা করে অন্যত্র। সেখানে বিফল হলে অন্যত্র। চল্লিশের কোঠায় পা দিয়ে অনেক পুরুষের মধ্যে যে মতিভ্রম দেখা যায়, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের হিড়িক দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার মূলে রয়েছে এই যৌন ক্ষমতা হারাবার আতঙ্ক এবং অবুঝ অমনোযোগী স্ত্রীর সমঝোতা ও সহানুভূতির অভাব। খুঁজে পেতে পুরুষ যদি এমন নারী পেয়ে যায় যার সান্নিধ্যে এলে তার সঙ্গমেচ্ছা জাগে বা লিঙ্গোদ্রেক হয় তাহলে গেল তার এতদিনের সোনার সংসার। বিনা দ্বিধায় পা দেয় সে ভুলের পথে।

ভুল কেন? কারণ নতুন সঙ্গিনী ডাল-ভাত হয়ে গেলেই আবার দেখা দেবে তার আগের সমস্যা। বয়স তো আর বসে থাকার জিনিস নয়, এটা যত এগিয়ে যাবে ততই প্রকট হয়ে দেখা দেবে তার অক্ষমতা। খিটখিটে হয়ে উঠবে মেজাজ, আসবে ভয়ঙ্কর মানসিক অবসাদ। তাস, জুয়া বা মদে শান্তি খোঁজার চেষ্টা করে এই সময় পুরুষ, কিংবা কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে ভোলার চেষ্টা করে সব কিছু।

যাই হোক, যত দিন যায়, হালকা হয়ে আসে তার দাড়ি-গোঁফ, গলার স্বর চিকন হয়ে যায়, লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ছোট হয়ে

যায় আরও। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে নুয়ে পড়তে শুরু করে মেরুদণ্ড। কিশোরীদের মত বাড়তে শুরু করে স্তন।

অর্থাৎ, সমস্ত মেয়েলী লক্ষণ দেখা দেয় পুরুষের শরীরে। এর কারণ, অ্যাড্রেনাল গ্ল্যাণ্ড শুধু টেস্টোস্টেরোন নয়, কিছু পরিমাণে ঈস্ট্রোজেনও তৈরি করে। এই দুই হরমোনের যথাযথ ভারসাম্য থাকা চাই। টেস্টোস্টেরোনের কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে ঈস্ট্রোজেনের প্রাধান্য মেয়েলী করে দেয় পুরুষকে।

কিন্তু এটা ঠেকাবার উপায় আছে। এর একমাত্র প্রতিকার টেস্টোস্টেরোন ইঞ্জেকশন বা লজেন্স। রোগ ধরা গেলে চিকিৎসা সহজ, কিন্তু রোগটা ধরা খুব সহজ নয়। প্রথমত অনেক ডাক্তার মানতেই চায় না যে একটা বিশেষ বয়সে লক-আউট ঘোষণা করে অণ্ডকোষ কারখানা। সত্তর-পঁচাত্তর বছর বয়সেও অনেক পুরুষের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা দেখেই তাদের এই বিভ্রান্তি। সামান্য পরিমাণে শুক্রকীট উৎপাদন আর যথেষ্ট পরিমাণে হরমোন উৎপাদন যে এক নয় সেটা কেউ বুঝিয়ে দেয়নি তাদের। তাছাড়া বেশির ভাগ পুরুষই জীবনের কোন না কোন সময়ে যৌন অক্ষমতাজনিত সমস্যায় ভুগে থাকে, অনভিজ্ঞ ডাক্তার বার্ধক্যের এই উপসর্গ দেখে এটাকে সেই আগের রোগেরই পুনরাবৃত্তি ধরে নিয়ে অযথা বাজে চিকিৎসায় সময় নষ্ট করে। অভিজ্ঞ ডাক্তার শুধু একবার প্রস্রাব পরীক্ষা করেই বলে দিতে পারেন আসল সমস্যাটা

কোথায়।

অণ্ডকোষের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড তার গোনাডোট্রোপিন হরমোনের সাহায্যে। অণ্ডকোষ কাজ বন্ধ করবার উপক্রম করলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড এবং অনেক বেশি পরিমাণে গোনাডোট্রোপিন তৈরি শুরু করে অণ্ডকোষকে কাজ চালু রাখার উৎসাহ দিতে চায়। কিন্তু কাজ হয় না এতে। ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে—ইচ্ছে থাকলেও টেস্টোস্টেরোন তৈরি করতে পারে না বেচারা অণ্ডকোষ, উৎপাদন কমে আসে ক্রমে। পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের তৈরি এই বাড়তি গোনাডোট্রোপিন বেরিয়ে যায় প্রস্রাবের সাথে। কাজেই চল্লিশোর্ধ্ব যে কোন পুরুষের যৌন অক্ষমতা দেখা দিলে প্রথমেই তার ইউরিন টেস্ট করে গোনাডোট্রোপিনের পরিমাণ দেখা দরকার। গোনাডোট্রোপিনের মাত্রা ঠিক থাকলে বুঝতে হবে সমস্যাটা মানসিক, যোগ্য মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু এই হরমোনের মাত্রাধিক্য দেখা গেলে বুঝতে হবে টেস্টোস্টেরোন কারখানায় লক-আউট আসন্ন। এই হরমোনের ঘাটতি পূরণ করে দিলেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমাধান হয়ে যায় সমস্যার।

টেস্টোস্টেরোনের ঘাটতি পূরণ হয়ে গেলেই আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় পুরুষের শরীরে। লিঙ্গোদ্রেকের অসুবিধা দূর হয়ে যায়, লিঙ্গ অণ্ডকোষ তাদের স্বাভাবিক

অবস্থা ফিরে পায়, দাড়ি-গোঁফ ঘন হয়, আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় বুক, শক্ত হয় হাড়, আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে, নৈরাশ্য আর অবসাদ দূর হয়ে গিয়ে ফিরে আসে তার উৎসাহ, উদ্যম, চোখের জ্যোতি। খোদাই ষাঁড়ের মত ঘুর ঘুর করতে শুরু করে স্ত্রীর পিছন পিছন। তার অতি উদ্যমের হাত থেকে স্ত্রীকে রক্ষার একমাত্র উপায় ওষুধের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ।

পাকস্থলীতে গেলে টেস্টোস্টেরোনের গুণ নষ্ট হয়ে যায়, সেজন্য ইঞ্জেকশন অথবা মুখের ভিতর মিউকাস মেমব্রেনের সাহায্যে শুষে নেয়ার উপযোগী লজেন্স ব্যবহার করা হয়।

হরমোনের ঘাটতি পূরণ হয়ে গেলেই যে সবাই সঙ্গমে সক্ষম হয়ে ওঠে এমন নয়। কারও কারও ক্ষেত্রে ওষুধপত্রের পরেও সঙ্গিনীর সমঝোতা ও সহানুভূতি একান্তভাবে জরুরী। অবুঝ অসহিষ্ণু স্ত্রীলোক তাদের বিরক্তি ও টিটকারি দিয়ে ব্যর্থ করে দিতে পারে যে কোন পুরুষের যৌনজীবন।

যাদের লিঙ্গ, প্রস্টেট, বা অণ্ডকোষে ক্যান্সার আছে তাদের উপর এই হরমোন থেরাপি প্রয়োগ করা যায় না। অবশ্য সেক্ষেত্রে তাদের আসল সমস্যা ক্যান্সার, যৌন অক্ষমতা নয়।

কারও কারও ক্ষেত্রে শুধু টেস্টোস্টেরোনে তেমন সুফল পাওয়া যায় না। সেই সাথে সামান্য পরিমাণে ঈস্ট্রোজেন দিলে দারুণ কাজ হয়। কেন এটা হয় কেউ জানে না, কিন্তু হয়। প্রয়োগ করে দেখা গেছে।

নারী-পুরুষ উভয়েই আমরণ চালিয়ে যেতে পারে হরমোন সেবন, আজীবন বজায় রাখতে পারে তাদের যৌন ক্ষমতা। সঙ্গমের আনন্দের তুলনা নেই। বার্ধক্য এলেই এই আনন্দে ইস্তফা দেয়ার প্রয়োজন নেই আর। জীবনের বাকি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা বছর নিজেকে অপ্রয়োজনীয়, আস্তাকুঁড়ের আবর্জনা মনে করবার কোন দরকার নেই। নিজেদের ভিতরটা ঠিক থাকলে অন্য চোখে দেখবে তারা পৃথিবীটাকে—জীবন যুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে তাদের যুবক-যুবতী সন্তান-সন্ততির পাশে। উপভোগ করে যাবে জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত।

বার্ধক্যের প্রেম

যে
যাই বলুক

শুনতে খারাপ শোনাচ্ছে, না? বুড়ো বয়সে ভীমরতির মত লাগছে না কথাটা?

তোমার কাছে হয়ত লাগছে না, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই ব্যাপারটাকে এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে অভ্যস্ত। বুড়ো মানুষরা আবার ওসব করবে কেন? তারা আল্লা আল্লা করবে, অপেক্ষা করবে মৃত্যুর জন্যে—তাদেরকে তো মানায় না ওসব কাজে। কেমন বিসদৃশ ঠেকে সমাজের চোখে।

ভাগ্যিস বুড়ো মানুষের খাওয়া-দাওয়া, মল-মূত্র ত্যাগ, ঘুমানো, ইত্যাদি কাজগুলোও বন্ধ করবার জন্যে কোন রকম সামাজিক চাপ নেই। তাহলে সব বুড়ো-বুড়ি সাফ হয়ে যেত দুনিয়া থেকে।

মাত্র দুটো পৌনঃপুনিক আনন্দ রয়েছে মানুষের জীবনে। খাওয়া আর সঙ্গম। পুরানো বা মলিন হয় না কোন দিন এ

আনন্দ। চরমানন্দের গভীরতা বিয়ের প্রথম বছর যতখানি, চল্লিশতম বছরেও ঠিক ততখানিই। পনেরো বছর বয়সে খেতে যত ভাল লাগে, একান্ন বছর বয়সেও ঠিক ততটাই লাগে—কিংবা তার চেয়ে বেশি। বিশেষ একটা বয়সে যেমন খাওয়া বন্ধ করার কোন যৌক্তিকতা নেই, তেমনি সঙ্গম বন্ধ করবারও কোন সঙ্গত কারণ কেউ দেখাতে পারবে না।

ছেলেমেয়েরা কি ভাববে, এই চিন্তায় অনেকে যৌন জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে। স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হলে অনেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এসব চিন্তা, অনেকে নিজে থেকেই ছেড়ে দেয়। দু'জনের মধ্যে কেউ দীর্ঘকালের জন্যে অসুস্থ হয়ে পড়লে চর্চার অভাবে আপনি-আপনি নষ্ট হয়ে যায় অনেকের সঙ্গমেচ্ছা, মৃত্যু হয় যৌন-জীবনের। কারণ রোগ থেকে সেরে উঠলেও আর ফিরে আসে না সঙ্গমের ইচ্ছে বা ক্ষমতা।

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, যাদের বয়স ষাটের বেশি, কোন কারণে তারা যদি দুই মাস সঙ্গম স্থগিত রাখে তাহলে আর কোন দিন শুরু করা সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। যারা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সঙ্গমের আনন্দকে অটুট রাখতে চায় তাদের জন্য সাবধান-বাণী এটা। চর্চা ছাড়লেই সব খতম। প্রয়োজন হলে ক্ষমতা হারানোর চেয়ে স্বমেহনের মাধ্যমে চর্চা বজায় রাখা অনেক ভাল। এতে সঙ্গমের তুলনায় আনন্দের

পরিমাণ কম, কিন্তু যত দিন পর্যন্ত না সঙ্গী বা সঙ্গিনী আবার সুস্থ হয়ে উঠছে ততদিন পর্যন্ত ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে হলে এছাড়া আর কোন পথ নেই।

আমরা কেউই চিরকাল বাঁচতে আসিনি এই দুনিয়ায়। বয়স বাড়ছে। বয়সের সাথে সাথে সবকিছু স্তিমিত হয়ে আসতে চাইবে। শুধু ডিম্বকোষ বা অণ্ডকোষ নয়, দুর্বল হয়ে আসবে পিটুইটারী আর অ্যাড্রেনাল গ্ল্যাণ্ডও। টুকিটাকি নানান রকম সমস্যা দেখা দেবে শরীরের অভ্যন্তরে। কিন্তু হেরে গেলে চলবে না। একে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে হবে। হাল ছেড়ে না দিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে...যতদিন আছি যতদূর সম্ভব ভাল থাকব।

ইচ্ছে করে নিজেকে পঙ্গু অথর্ব করে রাখার কোন মানে হয় না। অবশ্য নিজের ইচ্ছেমত যা খুশি ওষুধ খাওয়াও উচিত নয়। সুযোগ্য চিকিৎসকের অভাব নেই আমাদের দেশে, তাঁদের সহায্যে যে কেউ, বয়স যতই হোক না কেন, তার বার্ধক্যকে অর্থপূর্ণ, সুন্দর ও আনন্দময় করে তুলতে পারে।

আমি যুদ্ধ করব বলে স্থির করেছি।

পুত্র, আশা করি তুমিও তাই করবে।

যৌন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান

বিদ্যুৎ মিত্র

স্বীকারোক্তি:
বাংলা e-book-এর পাঠকেরা ছড়িয়ে আছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে এবং সব জায়গার ইন্টারনেট কানেকশনের গতি সমান নয়। তাই চেষ্টা করতে হয়েছে ফাইলের সাইজ যথা সম্ভব ছোট রাখার। ফলে অনিবার্য ভাবে কমাতে হয়েছে ছবির Resolution. পাঠকের এই অসুবিধার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

Scanned by: Shabab Mustafa

Send your feedback at:
Shabab.mustafa@gmail.com